অভিচিন্তন

অনুভবের দৃশ্যময়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান-পাঠ

ড. মালিক বদরী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

অভিচিন্তন

অনুভবের দৃশ্যময়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান-পাঠ

মূল

ড. মালিক বদরী

অনুবাদ

মোঃ লুৎফর রহমান

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

২

অভিচিন্তন

অনুভবের দৃশ্যময়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান-পাঠ

মূল

ড. মালিক বদরী

অনুবাদ

মোঃ লুৎফর রহমান

ISBN

984-70103-0011-5

প্রথম প্রকাশ:

জানুয়ারী ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, সফর ১৪৩০

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬

ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭, Email : biit_org@yahoo.com

মুদ্রণ

চৌকস প্রিন্টাস লিঃ, ঢাকা

মূল্য : ৫০.০০ টাকা, ৫.০০ ডলার

Obhichinton:Onobhober drishyamoyota, Islamer Dristikon Theke Monobigyaner Path (The meditation : from conciousness to seeing/ *Al tafakkur min al mushahada ila al shuhud, dirasa nafsia islamia*) Written by D.Malik Badri and translated into Bengali by Md. Lutfur Rahman, published by BIIT, House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara, Dhaka, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, E-mail: biit_org@yahoo.com. Price : 50.00 Tk. 5.00 Dollar

প্রকাশকের কথা

আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি যেমন হয় তেমনি জাগতিক উন্নয়নও তার অনুসারী হয়। আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ছাড়া মানুষের যেমন মানসিক বিকাশ সম্ভব হয় না তেমনি স্রষ্টাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধিও করা যায় না। আত্মার শক্তি বিকাশের জন্য সব সময়ই প্রয়োজন অনুধ্যান বা একনিবিষ্ট চিন্তা ও ধ্যান জ্ঞান। 'অভিচিন্তন' গ্রন্থটি সে লক্ষে একটি অভিনব সংযোজন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট অনেকদিন পরে হলেও দর্শন শাস্ত্রের এমন একটি অমূল্য সংযোজন তার প্রকাশনার অভিযাত্রায় সংযুক্ত করতে পেরেছে। দর্শনের আলোকে ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে অভিচিন্তন গ্রন্থটি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে স্বজ্ঞানলব্দ জ্ঞান, অভিচিন্তনে কুরআনের রীতি, ধ্যানমগ্নতা, ঈমান-বিশ্বাসের গভীরতা, মানসিক কেন্দ্রীকরণের সক্ষমতা, বস্তুসত্তা, অদৃশ্য বিষয়ে চিন্তা মগ্নতা, জাগতিক নিয়মে অভিচিন্তন-এর ন্যায় বিষয়গুলো এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, ধ্যানমগ্নতায় হারিয়ে যাওয়া অভিচিন্তক এ গ্রন্থ পাঠে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনে অনেক বেশী উপকৃত হবেন আমাদের বিশ্বাস। আমরা গ্রন্থটির অনুবাদককে ধন্যবাদ জানাই অনুবাদের মাধ্যমে অভিচিন্তনের ন্যায় এমন একটি গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য।

ড. মোঃ লুৎফর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

১।	পূর্বকথা	০৫
২।	ভূমিকা	০৬
৩।	লেখকের ভূমিকা	১২
৪।	আধুনিক মনোবিদ্যার আলোকে অভিচিন্তন	১৪
৫।	চিন্তন-প্রক্রিয়া ও অভিচিন্তন	২৬
৬।	অভিচিন্তান ও স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যান	৩৮
৭।	অভিচিন্তনের উৎসাহ-প্রদানে কুরআনের কতিপয় রীতি	৫০
৮।	ইসলাম নিজ বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে	৫৩
৯।	অভিচিন্তন মুক্ত স্বাধীন ইবাদত-উপাসনা	৫৭
১০।	অদৃশ্যবিষয়ে চিন্তামগ্নতা : এর সীমা-পরিসীমা	৬০
১১।	চিন্তাশীলতার স্তরে স্তরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পার্থক্যসমূহ :	৭০
১২।	বস্তুনিচয়ের সঙ্গে অভিচিন্তকের ঘনিষ্টতা	৭৭
১৩।	জাগতিক নিয়মে অভিচিন্তন: পরিপ্রেক্ষিত ধর্ম ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান	৮১
১৪।	তথ্যসূত্র	৯৫

পূর্বকথা

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট পাঠক ও শুভার্থীদের কাছে সানন্দে গ্রন্থটি উপস্থাপন করছে; যা আকারে ক্ষুদ্র, তবে বহুবিধ কল্যাণের ধারক, গভীর ভাবপ্রকাশক এবং মনোবিজ্ঞানের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তা সম্ভব হয়েছে এ বিষয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির দীর্ঘ দিন যাবৎ ক্লেশনির্ভর গভীর চর্চা ও মগ্ন গবেষণার পর। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মনোবিজ্ঞানকে উপস্থাপন করায় যারা নিবেদিত-প্রাণ, তিনি সেই দলের অন্যতম নেতা অধ্যাপক ড. মালেক বাদরি। অসংখ্য গবেষণায় তিনি বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। এখন বিষয়টি সুবিদিত এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী ও গবেষককেও এতে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছে।

সৌভাগ্য যে, গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করেছেন অধ্যাপক ড. ইউসুফ আল-কারজাভি। বিষয়ের চারুতা ও ভূমিকার সুন্দরতা মিলে তা যেন সোনায় সোহাগা।

শক্তিমান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন এর দ্বারা গবেষক, পাঠক ও বিষয়-সংশ্লিষ্টদের উপকৃত করেন। লেখক, ভূমিকা-রচয়িতা ও উন্নয়নকামী সংস্থাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। তিনি সাড়াদানকারী সর্বশ্রোতা।

ভূমিকা

আমাদের বর্তমান আরব ও মুসলিমদের সমস্যা হল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় আমরা অন্যদের পোষ্য, মুখাপেক্ষী। সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হোক বা মানবিক বিজ্ঞান– তারা উদ্ভাবক, আমরা গ্রাহক।

এই পরনির্ভরতার জন্য কোনোভাবেই ধর্ম বা আমাদের মূল্যবোধকে দায়ী করা উচিত নয়। যেমনটি আজকের দিনে অনেকে শুধু ধর্মাবলম্বীদের নিরিখে ধর্মের তুল্য-মূল্য করে থাকেন। যদি তারা পেছনের দিকে চোখ ফেরান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, বিশ্বে একদিন আমরাই ছিলাম সভ্যতার কর্ণধার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিতরণ করেছে। ভূপৃষ্ঠে আমাদের বিজ্ঞানীদের নামই ছিল সর্বাধিক পরিচিত। তাদের রচিত গ্রন্থাদিই কয়েক শতাব্দব্যাপী নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স হিসাবে কাজ করে বিশ্বব্যাপী। সেই সময়ে আরবি ভাষা– আমাদের এই আরবি ভাষা-ই বিজ্ঞানের একক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ যথা ব্রে-ফল্ট, জর্জ মার্টিন, গোস্তাফ, লোবান, উল ডুরান্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ তার স্বীকৃতিও দিয়েছেন।

এখন আমাদের দুর্বলতা, আমাদের অবহেলা শুধু বিজ্ঞানের দুটি শাখায়: জগৎ-সম্পৃক্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সমাজ-সম্পৃক্ত মানবিক বিজ্ঞান।

জাগতিক জ্ঞানের শাখাগুলো মৌলিকভাবে নিরপেক্ষ। দেশ-জাতি, রাষ্ট্র-ধর্ম, সংস্কার-সংস্কৃতির পরিবর্তনে এতে কোনো হেরফের হয় না। অবশ্য দর্শনগত ও পাঠদানগত পদ্ধতিতে পার্থক্য তো থাকবেই।

কিন্তু মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলো দূরপ্রসারী ভয়ঙ্করস্থল। কারণ এর সম্পর্ক মানুষের জীবন-আচরণ ও আনুষাঙ্গিকতার সঙ্গে। আবার তা জাতি, দর্শন, প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। জগত ও ধর্ম-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-চেতনা, জগত ও মানুষকেন্দ্রিক ভাবনা, আত্মা ও জড়কেন্দ্রিক বিশ্বাস, ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে এতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

এশাখাগুলো এখন চিন্তাদৈন্যের শিকার, এর প্রায়োগিক দিকও। এগুলোর উদাহরণসমূহ সরাসরি পশ্চিম থেকে আহৃত।

যাদের ধারণা যে, পশ্চিমে উদ্ভব হলেও এ জ্ঞানশাখাগুলো বৈশ্বিক, বাস্তবতা তাদের মিথ্যুক হিসাবে প্রতিপন্ন করে। এমনকি খোদ নিরপেক্ষ ইউরোপিয়ান সমালোচকদের কাছেও তারা মিথ্যুক হিসাবে অভিহিত।

তাই এক্ষেত্রে আমাদের ইউরোপ-অনুসরণ ছিল খাপে খাপে বাধা, তুলাদণ্ডে মাপা; যা আমাদের সংস্কৃতিতে, মূল্যবোধে, মানবিক-চারিত্রিক ও আত্মিক স্বকীয়তায় শঙ্কার সৃষ্টি করে।

আমাদের সমস্ত ভাবুক বিজ্ঞানীগণ, বিষয়-বিশেষজ্ঞদের উচিত এই সমস্ত জ্ঞানশাখার পাঠগভীরতায়, বিষয়ের নানাদিকে আলোকায়নে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অর্জন করা। তাদের অবস্থান হবে নিরীক্ষক ও সমালোচকের, বশীভূত অনুসারী-অনুগামীর নয়। তারা সামান্য ক্লেশ স্বীকার করে আমাদের সুবিস্তৃত ঐতিহ্যে ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন, আলোকিত অসংখ্য রাস্তা– যা তাদের সামনে রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দেবে। যখনই তারা দৃষ্টি প্রসারিত করবে আমাদের উত্তরাধিকারের দিকে তথা আমাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃতি, সুস্পষ্ট কুরআনের স্বচ্ছ ঝরনা, নবুয়ত-কেন্দ্রিক নির্দেশনা; সেই সঙ্গে দৃষ্টি ফেরাবে জাতির সেই বিরল সন্তানদের জীবনের দিকে; তখন এই সমস্ত জ্ঞানশাখার অনেক জটিলতাই খুব সহজে নিরসন হয়ে যাবে। উপকারী নব-উদ্ভাবনের সংযোজন ঘটবে এবং তা মুক্ত হবে জড়-প্রবণতা, পক্ষপাতিত্ব ও দৃষ্টিসঙ্কীর্ণতার ব্যাধি থেকে।

এভাবেই এই সমস্ত জ্ঞানশাখায় আমাদের নিজস্ব মতবাদ গড়ে উঠবে: মনোবিজ্ঞানের ইসলামি মতবাদ, সামাজিক বিজ্ঞানে ইসলামি মতবাদ ইত্যাদি।

আমি ইসলামি মনোবিজ্ঞান ও ইসলামি সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদির পরিবর্তে এই পরিভাষাকেই প্রাধান্য দিই।

এখানে আমি এই সমস্ত জ্ঞানশাখায় পশ্চিমাদের অর্জন-অবদানকে খাটো করছি না বা অস্বীকারও নয়। শূন্য থেকে শুরু করার প্রবক্তাও আমি নই। কারণ বিজ্ঞান হল পারস্পরিক সম্পর্কিত বৃত্তসমষ্টি, যা একে অপরকে জড়িয়ে রাখে, তেমনি পরস্পর পরস্পরকে সংশোধন-বিশোধন করে। আমাদের ঐতিহ্যই আমাদের বলে, প্রজ্ঞাবাণী মুমিনের হারানো বস্তু। যেখানেই এর সন্ধান মেলে, সে-ই এর হকদার। অতীতে আমরা তা গ্রহণ করে এসেছি। বর্তমানেও আমরা যদি তা কুড়িয়ে নিই, আমাদের কোনো কলঙ্ক হবে না ।

এই সমস্ত বিষয়ে যা-ই কিছু রচিত হবার, তা হয়েছে। আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্ক্স থেকে, সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুর্খেইম থেকে এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড থেকে উপকৃত হতে পারি। তাদের সব রচনাই যেমন নিরর্থক নয়, আবার সকল লেখাই নিষ্কলঙ্ক নয়।

কারণ আমাদের রয়েছে সমালোচনার অধিকার, যাছাই-নির্বাচন করার সুমিত রুচি। আমাদের মূল্যবোধ অনুসারে আমরা গ্রহণ-বর্জনে স্বাধীন। আমাদের প্রাণকে-বুদ্ধিকে সেই 'গুইসাপের গর্ত' থেকে উদ্ধার করবো, যাতে পশ্চিমা-দর্শনের দাস তথা উদারপন্থী বা সমাজতন্ত্রীগণ আটকা পড়ে আছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ মানব-সংশিষ্ট শাখা। আচরণবাদী মতবাদের কারণে এর বিষয়বস্তুতে, পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিসংখ্যান-

অনুমান– সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এর রয়েছে কার্যক্ষেত্র, গবেষণাগার, জড়পরিমাপক যন্ত্রপাতি। তা সত্ত্বেও এতে বিশেষজ্ঞ মুসলিম মনীষা কর্তৃক সংশ্লেষণের প্রয়োজন, যা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একে বিচার-বিশ্লেষণ করবে। মানব-প্রাণ তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও বাহ্যিক আচরণকে পাঠ করবে কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি দর্শনের সামগ্রিকতায়, পক্ষপাতহীনভাবে, ব্যাখ্যা ও বোধের সরলতায়, বাহ্যিক ও অন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন আমাদের সেই অতীত প্রতিভাদের আলোকোজ্জ্বল পথ ধরে।

আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে কতিপয় অগ্র-সেনানী নির্বাচন করেছেন, যাঁরা এতে দৃষ্টিগ্রাহ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা তাঁদেরকে 'জ্ঞানের ইসলামীকরণের সক্রিয় পুরোধা' হিসাবে অভিহিত করতে চাই।

তাঁদেরই একজন মিশরের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ উসমান নাজাতি। ইতোমধ্যে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: "কুরআন ও মনোবিজ্ঞান" ও "হাদিস ও মনোবিজ্ঞান" শিরোনামে। শিরোনামেই বিষয়-পরিচিতি স্পষ্ট করে তোলে। এখানে তাঁর শ্রম যথার্থ।

অধ্যাপক, গবেষক, মনোবিজ্ঞানী ড. মালিক বাদরি'র নাম সুদানে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে মনোবিজ্ঞানের পাঠদান, গবেষণা, রচনা ও চিকিৎসায় নিরত। ইসলামি সংস্কৃতি, ইসলামি মূল্যবোধ ও মানব-প্রতিভার প্রতি তাঁর গভীর আস্থার দরুন তিনি এই মতবাদ-মতাদর্শের অগ্রগণ্য পুরুষ। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মানব ও তার আচরণের পাঠ-গবেষণায় তাঁর অসংখ্য অনুসারী ও শিষ্য বিদ্যমান, যারা ঐতিহ্যবোধ ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়নে নিবেদিতপ্রাণ।

এ পর্যন্ত তিনি অসংখ্য মানসিক সমস্যা ও ব্যাধির নিরাময়ে বিশুদ্ধ ইসলামের একান্ত উপকারী ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। কারণ এতে রয়েছে ইমানি স্পর্শ, প্রভূকেন্দ্রিক ভাবার্থ, বাস্তববোধের প্রতীক, মানবিক চরিত্র-শিষ্টাচার এবং শরিয়ার হুকুম নির্দেশনা। তাঁর একান্ত বিশ্বাস নবীর সেই বাণীর প্রতি, যেখানে তিনি বলেন– "আলাহ তায়ালা যত রকমের রোগ-ব্যাধি দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাময়ের ঔষধও দিয়েছেন। যাকে ইচ্ছা এর জ্ঞান প্রদান করেছেন, আর যাকে ইচ্ছা এ ব্যাপারে অজ্ঞ রেখেছেন।"[১] মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও এ হাদিস প্রযোজ্য। যেমনটি শারীরিক ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থ তথা মালিক বাদরি রচিত 'অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা' ক্ষুদ্র হলেও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে একটি আদর্শ অনুসরণীয় গবেষণা। কারণ বিষয়টি এ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি "অনুভবের দৃশ্যময়তা" বলতে বুঝিয়েছেন অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক জ্ঞানের সাহায্যে সম্পন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে এর সূচনা হয়ে তা পৌঁছাবে সরাসরি ও দ্যুতিময়

---

[১] "সহিহ আল-বুখারি', চিকিৎসা অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যক্ষণের স্তরে, যেখানে সর্বত্রই আল্লাহর উপস্থিতি বিদ্যমান। ইবনে তাইমিয়া র. একে বলেন 'বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষণ বা নিখুঁত দৃশ্যময়তা' অর্থাৎ এখানে সর্বেশ্বরবাদ ও একত্ববাদের কোনো সংশ্লেষ নেই। এই প্রত্যক্ষণের প্রতিই নববি ব্যাখ্যার ইঙ্গিত : "আল্লাহ তায়ালাকে প্রত্যক্ষ করার মতোই ইবাদত করো"।

তিনি 'ইবাদত-উপাসনা' অথবা 'ইসলামি দায়' (যেমনটি একটি গ্রন্থে আল-আক্কাদ অভিহিত করেছেন) –এর বিষয়ে গবেষণা করেছেন। অবশ্য নবী করিম (সা.) তাঁর পথের অনুসারীদের নিকট শুধু এতোটুকুই প্রত্যাশা করেন যে, তারা যেন চিন্তা করে, জীবন পরিচালনা করে তাদের সনিষ্ঠ প্রশান্ত চিন্তার নির্দেশনা অনুসারে।

> *"বলুন হে নবী! আমি তোমাদের একটি মাত্র উপদেশ দিই : তোমরা আল্লাহর জন্য সচেষ্ট হবে, দুজন-দুজন বা পৃথক-পৃথকভাবে। এরপর চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, তোমাদের সঙ্গীর উন্মাদনা নেই। তিনি তোমাদের সামনে কঠিন শাস্তির সতর্ককারী মাত্র।"* (সাবা : ৪৬)

'আল্লাহর জন্য সচেষ্ট হওয়া'– এর অর্থ হল, সত্যার্জনে নিষ্ঠাবান হওয়া। 'দুজন-দুজন ও পৃথক-পৃথক'–এর ব্যাখ্যা হল, সামষ্টিক বুদ্ধির প্রভাব ও চাপমুক্ত হওয়া।

লেখক অভিচিন্তনকে ইবাদত-উপাসনা হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি জোর প্রদান করেন, যে ইবাদতের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই মুসলিমগণ আন্তরিক ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান-সাগর ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "সারা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করার চেয়ে এক ঘণ্টার অভিচিন্তন অনেক উত্তম।"

কেউ কেউ বলেন, "এক বছরের ইবাদতের চেয়ে এক ঘণ্টার অভিচিন্তন অনেক উত্তম।"

লেখক গুরুত্বসহকারে অভিচিন্তনকে মুক্ত স্বাধীন ইবাদত হিসাবে অভিহিত করেন, আল্লাহর প্রকৃতি ও সত্তা-বিষয়ক অভিচিন্তন ছাড়া যার কোনো কালিক-স্থানিক, দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিবন্ধক নেই। তুলনা করেন চিন্তন-ক্রিয়া ও অভিচিন্তন, অভিচিন্তন ও স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যানমগ্নতার মাঝে– যার পরিচয় পাশ্চাত্য লাভ করেছে প্রাচ্য থেকে অতি সম্প্রতিক কালে। বর্ণনা করেছেন অন্য সব ভাবুক ও গবেষকদের তুলনায় মুসলিম অভিচিন্তকের মর্যাদা– যিনি দিক-দিগন্তে, মানব-প্রাণে এবং আল্লাহর রীতি-পদ্ধতি নিয়ে ভাবেন। কারণ তার সমুখে এতোসব প্রেরণা-প্রণোদনা বর্তমান, যা অন্য কারো জন্য নেই। সে আল্লাহর কাছে যা প্রত্যাশা করে, অন্যরা তা পারে না।

মুসলিম জাতির স্বর্ণযুগে এরই প্রতিবিম্ব চোখে পড়ত। তারা বিস্ময়কর সেই সভ্যতা নির্মাণ করেছিলেন, যার ভিত্তি ছিল ইমান ও বিজ্ঞান। এই সব আলোচনাই ড. বাদরি'র লেখায় উঠে এসেছে আমাদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের উল্লেখকরণের মাধ্যমে, যেমন- গাজ্জালি, ইবনুল জুজি ও ইবনুল কাইয়ুম প্রমুখ রচিত

গ্রন্থ থেকে। এই গবেষণায় লেখক আচরণিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত, যা ওয়াটসন কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং মনোবিজ্ঞানে ব্যাপক পরিচিত। নিজেদের প্রয়োজনেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাকেন্দ্র এ চিন্তা-আদর্শকে মজুতকরণে সিদ্ধহস্ত। এই মতাদর্শ মানব-চিন্তার গূঢ় প্রণোদনাগুলোকে উদ্দীপক ও আলোড়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসাবে সরলীকরণে প্রভূত চেষ্টা ব্যয় করেছে। তাই মনোবিজ্ঞান আজ সূক্ষ্ম নিরীক্ষামূলক জ্ঞান হিসাবে পরিণত। আচরণবাদীদের কর্মকাণ্ড এতোটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে যে, মানুষের বিষয়ে তাদের সরল ও আদর্শ ধারণা হল যে, সে একটি অন্ধ যন্ত্র মাত্র; যে কি-না পরিবেশের সীমিত উদ্দীপনায় স্পৃষ্ট হয়। যেন গবেষকের প্রত্যাশা ও অনুসন্ধান অনুযায়ী আলোড়নে প্রস্তুত থাকে।

সূক্ষ্মদর্শী লেখক তীব্র সমালোচনা করেছেন সেই অতিরঞ্জনের, যার উদ্ভব ঘটে মনোবিজ্ঞানের পূর্ববর্তী প্রবণতা ও মতবাদের নিরিখে। উদ্ধৃত করেছেন বৃটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'শার্ল ব্যারেট'–এর সেই প্রসিদ্ধ পরিহাস-বাক্য: "আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রথমেই আত্মহত, এরপর অনুভব-শূন্য এবং সর্বশেষে বুদ্ধিশূন্য।"

আচরণবাদীদের ধারণা মতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান যেন নিরীক্ষণমূলক জ্ঞানে পরিণত হতে পারে, সেই জন্য তারা মানুষকে অনুভবশূন্য, গূঢ় চিন্তা ও বুদ্ধির আবরণমুক্ত করতে প্রস্তুত। যেমনটি তারা পূর্বেই একে আত্মাশূন্য করেছে।

পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির মতো মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাকেও সমালোচনা করেছেন লেখক। কারণ জড়পদার্থের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, কিন্তু মানব আচরণ এর বিপরীত।

তেমনি বুদ্ধিকে মস্তিস্কের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের ব্যাপারে জড়বাদীদের সমালোচনা করেছেন। জড়বাদীদের দাবি, আমরা যাকে 'ভাবুক-চিন্তক বুদ্ধি' বলে অভিহিত করি, তা মূলত মস্তিষ্কের রসায়নে, এতে সংগুপ্ত বৈদ্যুতিক-রসায়নে শিরার গোপন পরিবর্তনের-বিবর্তনের প্রতিবিম্ব মাত্র।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞগণ অন্যান্য বিষয়ের বিজ্ঞ মতাদর্শীদের মতো দীর্ঘ দিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পর্যালোচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা থেকে লেখক প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। তারা মানুষের সকল আচরণকেই সাধারণ অর্থে সীমিত বিশেষ ছাঁচে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট।

মানুষের অভ্যন্তরীণ চিন্তা-প্রণোদনাই –ব্যক্তির অনুভূত হোক বা না হোক– তার আচরণ, বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন উদ্দীপনা এবং এর প্রত্যক্ষ আলোড়ন সত্ত্বেও পরিবেশই মানুষের প্রধান আচরণ-নির্দেশক নয়, তার আচরণের মূল ভিত্তিও নয়। যেমনটা আচরণবাদের মতাদর্শীগণ বলে থাকেন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান যে পর্যায়ে উপনীত, তা ইসলাম নির্দেশিত অবস্থানকেই দৃঢ় করে মাত্র। তা হল, আপন-প্রাণে, দিক-দিগন্তে সম্প্রসারিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহে

অভিচিন্তনই ইমান-বিশ্বাসের মূল মেরুদণ্ড। যার থেকে উৎসারিত হয় সকল উত্তম কর্ম।

আটটি অধ্যায়-সম্বলিত পুস্তকটি মানবিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইমান, উচ্চতর আত্মার মূল্যবোধের সেবা প্রদান যে সম্ভব, তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ, একই সঙ্গে মানবসেবারও। পুরনো চিন্তার পিছুটান ও আধুনিক চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত মুসলিম বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীগণ যদি পুনরায় কুরআন-সুন্নাহকে আলোকবর্তিকা হিসাবে ধরে এর চর্চায় নিবিষ্ট হন; তাহলে তাদের জন্যই সমন্বিত হবে ইমান ও ওহির জ্যোতি, বুদ্ধি ও প্রকৃতির জ্যোতি। তখনই আল্লাহর বাণী: *"জ্যোতির উপর জ্যোতি"* (আল-নুর :৩৫) বাস্তবে রূপায়িত হবে।

বিষয়টি আরো বিস্তৃত ও পরিবর্ধিত হতে পারে। লেখকের সে যোগ্যতা বিদ্যমান। আশাকরি, পরের সংস্করণে তা তিনি করবেন,ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাকে তাওফিক দিন। জাতি ও ধর্মের পক্ষ থেকে তাকে উপকার ও উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

অধ্যাপক ড. ইউসুফ আল-কারজাভি
দোহা, কাতার।

লেখকের ভূমিকা

এ গ্রন্থটি ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল-বিষয়ক অভিচিন্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। এখানে ইবাদতকেন্দ্রিক চিন্তার মূল্য ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে এর আলোচনা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। তেমনি জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণা, অভিচিন্তন ও স্বজ্ঞালব্দ/ অলৌকিক ধ্যানমগ্নতার (Transcendental Meditation) বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি, যা চিন্তার গুরুত্ব প্রকাশে, জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে, মানুষের অনুভূতি-সৃষ্টিতে, আচরণ-আবেগের দিক-নির্দেশনায়, অভ্যাস-গঠনে, অস্থিরতা নিরাময়ে, আত্মিক ও মানসিক জীবনের উদ্বোধনে ধ্যানের মূল্যকে প্রতিপন্ন করে।

তেমনি করে চিন্তার প্রকৃতি, স্তরভেদ মুসলিম উত্তরাধিকারের জ্ঞানকাণ্ড তথা ইমাম গাজ্জালি, ইবনুল কাইয়ুম প্রমুখের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবচ্ছেদ করেছি। 'অনুভব থেকে দৃশ্যময়তা'র চিন্তার স্তরায়ণে ইসলামি মনোবিজ্ঞানের ধারণার প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। অর্থাৎ যার সূচনা ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তর থেকে এবং সমাপ্তি উজ্জ্বল দৃষ্টি গোচরতা ও প্রত্যক্ষণের পর্যায়ে। ইবনে তাইমিয়া একেই "নিখুঁত দৃশ্যময়তা"[২] নামে অভিহিত করেন। এ পর্যায়ে যারা পৌঁছতে পারেন, তাদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল : "তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা, ইচ্ছা ও ইবাদত-উপাসনা ছাড়া কিছুই নেই। সকল সৃষ্টিজীবই তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত, বরং অনুগত সাড়াদানকারী।"[৩]

এরপর কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করেছি, যা নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। ভাবনা-প্রকৃতি তথা ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বাধীনতার মত মুক্ত স্বাধীন ইবাদত হিসাবে এর অবস্থা; মুমিন-বিশ্বাসীর ধারণার গতি, আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতি-সত্তা বিষয়ক ভাবনা ছাড়া যার কালিক-স্থানিক, দৃশ্য-অদৃশ্য কোনো প্রতিবন্ধকা নেই– এ আলোচনাও উপস্থিত।

চিন্তামগ্নতার স্তরে ব্যক্তিক পার্থক্য-বিষয়ক আলোচনায় স্বভাবগত ও পরিবেশকেন্দ্রিক উপাদানের গুরুত্বও স্থান পেয়েছে, যে স্বভাব এবং পরিবেশ মুমিনের ভাবনা ও চিন্তার ক্ষেত্রে গভীরতার সৃষ্টি করে, অন্যান্য ইবাদত-উপাসনা থেকে চিন্তামগ্নতাকে ইবাদত-উপাসনা হিসাবে অধিক গুরুত্ব দেয়। মানসিক মনোযোগিতা-কেন্দ্রীভূতকরণের ক্ষমতা, মুমিন-বিশ্বাসীর বৌদ্ধিক ও সংবেদনশীল অবস্থা, ভাবিতব্য

---

[২] ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া', আল-রিয়াদ প্রকাশনী, দশম খণ্ড, পৃ : ২২১-২২৫।

[৩] পূর্বোক্ত।

বিষয়ের পরিচিতি-পর্যায়, সঙ্গ-প্রভাব ও নিখুঁত আদর্শ ইত্যাদি উপাদানসমূহ মুমিনের উপকারী হিসাবে কাজে লাগতে পারে, যিনি চিন্তা-গভীরতা ও এর প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণের জন্য অর্জিত প্রক্রিয়া-প্রণোদনার অনুশীলনে জোর দেওয়াসহ একে মৌলিক ইবাদত হিসাবে পুনর্বিবেচনায় সচেষ্ট।

গবেষণার সমাপ্তি ঘটেছে জাগতিক বিধানে অভিচিন্তনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific Method) তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। কারণ তা সুদৃঢ় পর্যবেক্ষণ, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিশেষ নিরীক্ষণ ও সাধারণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। এদুটোর সাদৃশ্যময় দিক এবং বাহ্যিক পার্থক্যগুলো তুলে ধরেছি। নিরীক্ষা-প্রবণ বিজ্ঞানীদের কতিপয় উদাহরণও পেশ করেছি। যাদের গবেষণা এই সিদ্ধান্তে-বিশ্বাসে স্থিত যে, এজগতের আড়ালে একজন বিজ্ঞ কৌশলী প্রভু নিয়ন্তা বিদ্যমান। তেমনি ইসলামি উত্তরাধিকারের ভাবুক আবেদ-খোদাভক্তদের উদাহরণ উপস্থিত, জাগতিক নিয়ম-কানুন ও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-বিষয়ক গভীর ভাবনা-অভিচিন্তন তাদেরকে যে বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত করেছে, তাদের মৃত্যুর শত বৎসর পর যে সত্য আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণিত।

জাগতিক রীতি-পদ্ধতি-বিষয়ক ভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাঝে এই সম্পর্কের পাঠ-গবেষণা একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ; আধুনিক শিক্ষাদান ও মনস্তাত্ত্বিক পাঠ-গবেষণার চিন্তা-সূত্র নির্মাণে একে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করি। এই গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য নির্মাণ করেছি "বিজ্ঞান ও ইবাদতের মাঝে মানুষ ও জগত-বিষয়ক ভাবনা" শিরোনামে, যা ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের "সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের জার্নালে ১৪০১ হিঃ প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীগণ সেই গবেষণাকে যে উষ্ণ-অভ্যর্থনায় গ্রহণ করেন, তা-ই আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট- এর প্রতি, বিশেষত খুরতুম শাখায় দায়িত্বশীলদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ গ্রন্থ রচনায় লেখককে নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য।

মালিক বদরী
খুরতুম
২০ শাওয়াল
১৪০৯ হিজরি।

আধুনিক মনোবিদ্যার আলোকে অভিচিন্তন

অভিচিন্তন মনোবিজ্ঞানের আলোকে চিন্তার মনস্তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত। এ ছিল প্রথাগত মনোবিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্রস্থল, যখন কি-না মনোবিজ্ঞানের উপর আচরণবাদীদের (School of behaviourism) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্ভব ও সূচনা-কালে মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব নিবদ্ধ ছিল মানুষের চিন্তা-পাঠে, অনুভবের ব্যাপকতায়, বুদ্ধির নির্মাণে। এই কতিপয় ডিসকোর্স ছাড়া অন্য কোনোভাবে শিক্ষা-বিষয়ে তা গুরুত্ব প্রদান করত না। আচরণবাদীদের (School of behaviourism) প্রচলিত তথ্য-তত্ত্ব নিয়ে স্বহালে বহাল ছিল অনেক দিন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন এসে এর অনেক কিছুই আমূল পাল্টে দেন। উদ্দীপক পন্থায় এবং প্রকাশ্য বাহ্যিক আলোড়নের পদ্ধতিতে যে পাঠ-গবেষণা সম্ভব, তাই মনোবিজ্ঞান শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে স্থিরতা পায়। অনুভব, বুদ্ধি ও চিন্তার উপাদানগুলো এমন সব ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত, যা সরাসরি বীক্ষণযোগ্য নয়। তেমনি এর পাঠ-গবেষণার জন্য যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হত, যেমন- অন্তর্বীক্ষণ (Introspection), সেগুলো এই বলে সমালোচিত হয় যে, তা বিজ্ঞ পরিশোধনের অনুপযুক্ত। এজন্যই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত আচরণবাদীদের (School of behaviourism) একটি কামনা ছিল, একে সূক্ষ্ম অভিজ্ঞ জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে দাঁড় করানো; যা পরীক্ষণযোগ্য, বীক্ষণযোগ্য এবং প্রকাশ্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সপ্রাণ জগতের কাছে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ অনুভূত চিন্তিত প্রণোদনাকে তারা সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনার ফল হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এই প্রণোদনাকে একটি তালাবদ্ধ বাক্স হিসাবে বিবেচনা করেন, যার অন্তর্গত বিষয়সমূহের সূক্ষ্ম অবহিতি একেবারেই অসম্ভব। এ জন্য এর পাঠ-গবেষণায় সময় ব্যয় অনুচিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রণোদনার কারণে যে প্রকাশ্য আলোড়ন দৃষ্ট হয়, যাকে ধারণা করা যায়, যার উপর নির্দেশ চাপানো যায়; এসবই তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সম্পর্কে তাদের সহজ আদর্শ ধারণা হল যে, সে একটি অন্ধযন্ত্র, যা সীমিত পরিবেশের উদ্দীপক পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়; যেন সে গবেষকের প্রার্থিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহে আলোড়িত হতে পারে। আচরণবাদের (School of behaviourism) প্রবক্তাগণ এই পর্যন্ত বলেন যে, চিন্তন-প্রক্রিয়া হল উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ ও আলোড়নের ঘনিষ্ট সামিষ্টিক রূপমাত্র, যা ব্যক্তির অন্তর্সংলাপ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। এটা এ জন্য যে, তারা মানুষের অন্তর্গূঢ় ভাবনার সকল প্রেরণা-প্রণোদনাকে উদ্দীপক ও আলোড়নের একটি শৃঙ্খলিত ধারাবাহিকতা হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে জোর প্রদান করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, মনোবিজ্ঞান একটি সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে পরিগণিত হয়।

লেখক যেমন অন্য একটি গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মতো এই সূক্ষ্ম জ্ঞানকাণ্ডগুলোও কালের অনেক ব্যবধান পেরিয়ে এসেছে। ঐতিহাসিক

ক্রম-বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুন তা শুধু অবচেতনভাবেই হয় নি। বরং নিরেট জড়-প্রকৃতি হওয়ার কারণে তা গুরুত্ববহ পথ অতিক্রম করে। এভাবেই সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম একক সমষ্টিতে পরিণত হয়, ব্যাপক তত্ত্বনিচয়ের রূপ লাভ করে; যা একই সঙ্গে জড়-আচরণ, শক্তি ও সীমিত পরিধিতে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞানকাণ্ডগুলো এই দুটি প্রবণতা ছাড়া এইভাবে এগুতে পারত না।

প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থেকে অণু-পরমাণু এবং তার উপাদান সৃষ্টি না হলে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে পারত না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক একটি জীবাণু জীব-বিদ্যার (biology) মৌলিক একক, এই জিনগুলোই প্রজনন-শাস্ত্রের (genetic) এককসমষ্টি। এভাবে উদাহরণ বৃদ্ধি করা যায়।

এখন কথা হল, মনোবিজ্ঞানে জীবজগতের আচরণের মৌলিক এককগুলো কী? অবশ্য আচরণের গূঢ় প্রকৃতিকে এককের মত উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। মনোবিজ্ঞানের এই শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য যদি কোনো ধারণাকে এখানে রাখা হয়, যেমন শর্তযুক্ত প্রতিবিম্বিত কর্মচিন্তা; তা নিস্তেজ ও বিলুপ্ত হতে বাধ্য। শর্তযুক্ত প্রতিবিম্বিত এই কর্মকে আমরা এই জটিলতাকে স্পষ্ট করার জন্য গ্রহণ করতে পারি। কারণ মনোবিজ্ঞানের সবচে' সহজ ডিসকোর্স হিসাবে তা একটি উত্তম প্রমাণ হবার যোগ্যতা রাখে। তাই আচরণবাদের (behaviourism) কতিপয় প্রবক্তাগণ একে নির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে আচরণের একক হিসাবে গণ্য করতেন। শর্তযুক্ত প্রতিবিম্বিত কর্ম যদিও সহজ-সরল শিক্ষাদান কর্মসূচীকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যা প্রায়শই মনঃক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একে বাস্তবিক পক্ষে মনোবিজ্ঞানের একক হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হয় না। কারণ, মনোবিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা, ডিসকোর্সই শর্তারোপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পায় না। যেমন- সামাজিক মনোবিজ্ঞান, মানবতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান (Humanistic Psychology), ইন্দ্রীয়ানুভব এবং ভাষা-শিক্ষা প্রভৃতির কোনোটাই শর্তযুক্ত শিক্ষার ধারণার উপর নির্ভর করে না, চাই তা ধ্রুপদী পদ্ধতিতে হোক অথবা উদ্দীপক বা আলোড়ক পদ্ধতিতে। তেমনি এ মানবিক আচরণের গভীর ও জটিল গূঢ় দিকগুলোর ব্যাখ্যায় অপারগ। উদাহরণ হিসাবে ভালবাসার ব্যাখ্যা সে কীভাবে করবে উদ্দীপক ও প্রতিবিম্বিত শর্তযুক্ত আলোড়নের পদ্ধতিতে? কারণ মানুষের গূঢ় আচরণ-প্রকৃতি এ সমস্ত কঠিন বিভাজনের উপযুক্ত নয়।

গ্লুকোজের শর্করা স্তর-সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সরলতার সাহায্যে মানবিক আচরণের স্তর-সৃষ্টির লক্ষ্যে শারীরিক, মানসিক ও সভ্যতাকেন্দ্রিক-আত্মিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের মিথস্ক্রিয়া একেবারেই অসম্ভব। যেমনটি ঘটে আলোকচিত্র গ্রহণের কর্মকাণ্ডের সময়ে, যখন পানি ও দ্বিতীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে শর্করা উৎপাদনের জন্য তৃণ সৌরশক্তি ব্যবহার করে।

মুসলমানদের জন্য সমস্যা আরো গভীর হয়ে ওঠে তখনই, যখন দেখতে পাই যে, মানবিক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের হিসাব-বহির্ভূত হয়ে পড়ে। আর তা হল, আত্মিক কর্মপ্রক্রিয়া। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ এর গুরুত্ব প্রকাশ করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান যেহেতু মানবিক আচরণের একক উপাদান-সমষ্টি হিসাবে সভ্যতাকেন্দ্রিক, সামাজিক, জীবতাত্ত্বিক ও যন্ত্রতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই তা আত্মিক ডিসকোর্সের তুলনায় অনেকটাই সহজ অথবা যেহেতু আত্মিক ডিসকোর্সকে আলোচনার বাইরে রাখে– তাই তা অনেক সহজ। কারণ আত্মার সম্পর্ক ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে, যা ক্রমান্বয়ে পূর্ণত রহস্যের মরুভূমিতে পরিণত হয়। আর তা যেন কোনো বস্তুর অভ্যন্তরে কার্বন না থাকা সত্ত্বেও এর থেকে গ্লুকোজ-শর্করা নিস্কাষণের প্রত্যাশা রাখা অথবা বিশুদ্ধভাবে বলতে গেলে তা যেন সৌরশক্তিকে হিসাবে না রেখে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন- এই তিনটি রসায়ন উপাদানের মাধ্যমে গ্লুকোজের শর্করা নির্গমনের চেষ্টা করা শুধু আলোকচিত্র গ্রহণের প্রক্রিয়ায়। এ কাজটি এ তিনটি জড়-উপাদানের সীমানায় অত্যন্ত জটিল!

মানবিক আচরণের এই গূঢ়তার প্রকাশ্য রূপসহ যুগপৎ আত্মিক ডিসকোর্সকে পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের আওতাবহির্ভূত রাখার কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয়বারের মতো একটি ব্যাপক পূর্ণতত্ত্ব হিসাবে রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অথচ অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব বা ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানে একটি পূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য কোনো কোনো ঘরানা (School of thought) এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞগণ এ প্রচেষ্টা যে করেন নি, তা কিন্তু নয়। যেমন- মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব, সামগ্রিকতাবাদ (Gestalt theory) এবং শিক্ষণ-মনস্তত্ত্বের কতিপয় শাখা-প্রশাখাকে আবিষ্কার করা হয় ব্যাপক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দাঁড় করানোর জন্য। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় পুরোপুরি এবং এখন এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে আছে মাত্র।[৪]

তখন মনোবিজ্ঞান পরিপূর্ণভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান হিসাবে পরিণত হয়। যেমন- আচরণবাদের (behaviourism) প্রবক্তাগণ বলে থাকেন; তারা মানুষকে তার অনুভূতি, বৌদ্ধিক পরিসীমা এবং গূঢ় চিন্তার পর্যায় থেকে সরিয়ে আনেন। অবশ্য অনেক পূর্বেই তাকে আত্মিক পরিসীমা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়েই

---

[৪] মালিক বাদরি, 'ইলম আল-নাফস মিন মানজুর ইসলামি', দেখুন- ইসলামি পদ্ধতিতে শিক্ষণ ও আচরণিক জ্ঞান : আন্তর্জাতিক ইসলামি চিন্তাবিষয়ক চতুর্থ সম্মেলনের গবেষণা ও পর্যালোচনা। তৃতীয় খণ্ড, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষণ পদ্ধতি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, হারন্ডন, ভার্জেনিয়া, ১৯৯২, পৃ : ৩৩১-৩৮২।

বৃটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'শার্ল ব্যারেট' ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন যে, "আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রথমে তার আত্মাকে হারায়, পরে অনুভূতিকে এবং শেষ পর্যন্ত তা একেবারেই বুদ্ধিহীন হয়ে আছে।"

অবশ্য আচরণবাদের ধারণা যে সমস্ত সমস্যা উত্থাপন করেছিল, তারা এর অধিকাংশের সমাধানের ব্যাপারেই অপারগ। অন্যদিকে আধুনিক পাঠ-গবেষণা জীবতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানে আচরণ-ভাবনার ধরন-ধারণ ও এর অভিজ্ঞতা বিষয়ে চরম বাহ্যিকতার জন্ম দিয়েছে। এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ে ভাষাশিক্ষা, ধারণা-নির্মাণ, সমস্যা-নিরসন এবং মানুষের কাছে তথ্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে। এজন্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে মনোবিজ্ঞান জ্ঞানতাত্ত্বিক ও চিন্তন-বিষয়ক কর্মপ্রক্রিয়ার যথাযথ মূল্যায়নে উদ্যোগী হয়। অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক মাধ্যমগুলোকে গুরুত্ব দিতে থাকে, যাকে মানুষ আপন পরিবেশ থেকে নির্গত তথ্যাদির সংকলনে-সন্নিবেশে ব্যবহার করতে থাকে। একই সঙ্গে মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে একে রেখাচিত্র হিসাবে গণ্য করে। বৈজ্ঞানিক এবং ধার্মিক দিক থেকে অভিচিন্তনের মূল্য নিরূপণের জন্য এই নতুন প্রবণতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রবণতার এই অবস্থাকে মনোবিজ্ঞানের আদি চরিত্রের উদ্‌ঘাটন হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে চাই তা মানুষের আচরণিক পাঠ-গবেষণা বা অন্যান্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে হোক কিংবা কম্পিউটার বিস্ফোরণে– বর্তমানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসকল আধুনিক যুগে মনুষ্য-কর্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যম-উপায়ের উপর নির্ভর করে বেশি। এই সমস্ত পাঠ-গবেষণার ধারা মানুষের সীমিত যান্ত্রিক ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে, যা আচরণবাদীকর্তৃক সৃষ্ট এবং মনুষ্য-ধারণা হিসাবে নির্ধারণ করা হয় তথ্যাদির সংকলন ও সন্নিবেশের ব্যাপারে সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং উদ্দেশ্য-প্রাপ্তির লক্ষ্যে। তাই আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে মানুষের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তন-ক্রিয়া কম্পিউটার যন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ মানুষজনও নিজ পরিবেশ থেকে নানা উদ্দীপকের মুখোমুখী হয়, তখন সে এগুলোর প্রতীকায়নের কাজ করে, এগুলোকে বিন্যাস করে, এরপর তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। উদ্ভূত নিত্য-নতুন সমস্যা-সমাধানের জন্য এর কাছেই ফিরে যায়।

এই ধারণা আচরণবাদের তুলনায় অনেক বাস্তবসম্মত। কারণ তা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। তবুও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের যে ধারণা তা থেকে যোজন যোজন দূরে।

সন্দেহ নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সত্ত্বেও এই অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের পঠন-পাঠন সবসময়ই গূঢ়তম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাতে সকল উদ্দীপনা, আলোড়ন, প্রশ্ন-উত্তর পারস্পরিকভাবে এমনইভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, এর পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিকভাবে বিচার-বিবেচনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের অভ্যন্তরীণ মনোজগত ও বৌদ্ধিক জগতের পঠন-পাঠন আমাদেরকে এমন একটি জটিল গূঢ়

প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়, যা নিয়ে প্রতিটি মানুষই ভাবিত অথবা ধর্ম-ভাবনা তাকে এ প্রশ্নের যোগান দেয়। আর তা হল বুদ্ধি এবং শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরনটা কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দার্শনিক চিন্তা, ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পাঠ, অঙ্গসংক্রান্ত (organology) গবেষণা এবং মানুষের জীবতাত্ত্বিক (biologycal) বিষয়ের পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system)।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যদি বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বিষয়ে মতানৈক্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরি, তাহলে তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মনুষ্য-মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনেক কিছুই আমাদের অজানা থাকলেও জড়বাদীগণ বলে থাকেন যে, মানুষের স্বতন্ত্র কোনো বুদ্ধি নেই। তবে এর দ্বারা শুধু সেই জড় মস্তিষ্ককে বুঝানো হয়, যা আমাদের সবাই নিজ খুলির অভ্যন্তরে বহন করে। তারা আরো বলেন, আমরা যেটাকে চিন্তক বুদ্ধি হিসাবে অভিহিত করি, তা মস্তিষ্কের রসায়নে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও বিদ্যুৎ-রসায়ন-কেন্দ্রিক (Electrochemical) স্নায়ু-কম্পনের প্রতিবিম্ব এবং এক রকমের রূপান্তর মাত্র। তাঁদের এ মতকে প্রমাণসিদ্ধ করেন এই যুক্তিতে যে, মানুষের ভাবনা-চিন্তা– এমনকি তার ব্যক্তিত্বও– মস্তিষ্কের সামান্যতম বিনষ্টিতে পরিবর্তন হয়ে যায়।

তাদের বিরোধী সম্প্রদায় এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়ে বলেন যে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক বুদ্ধিসত্তর বিদ্যমান। এদের নেতৃত্বে আছেন বিখ্যাত স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ, স্নায়ুতন্ত্রের বিষয়ে মূল্যবান গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত Eccles[৫]। তিনি এবং তার অনুসারীগণ বলেন, মানব-মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের তৎপরতা বিষয়ে গবেষকগণ যে তথ্য-সমাবেশ করেছেন, বুদ্ধি বা অনুভবসম্পন্ন মনের অস্তিত্ব ব্যতীত এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অসম্ভব; যে বুদ্ধি বা অনুভব শক্তি মানুষের স্নায়ু-প্রক্রিয়া ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গবেষক এ ব্যাপারে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই। তিনি বলেন "যদি বৈদ্যুতিকভাবে আমরা মানব-মস্তিষ্কের কোন অংশকে স্পর্শ করি, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবো যে, তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। তখন যদি তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মস্তিষ্ক-স্পৃষ্টির পরও হস্তকম্পন হতে পারবে না; –অভিজ্ঞতার জন্য তা করা যেতে পারে– তাহলে সে অন্য হাতের সাহায্যে তার হস্তকম্পন রোধ করার চেষ্টা করবে।" এরপর তিনি এখানে প্রশ্ন রাখেন, "তার হস্তকম্পন তৈরি করল কে? কে-ই বা তা রোধে উদ্যোগী হল এবং তা রোধ করল?" জবাব স্পষ্ট : মস্তিষ্ক তাকে কম্পিত করেছে এবং বুদ্ধি কম্পন রোধ করেছে। অর্থাৎ এভাবেই বুদ্ধির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

---

[৫] John Eccles, 'Facing Reality : Philosophical Advetures by a brain Scientist', New York : Springer-Verlag, 1970.

এই সমস্ত বিজ্ঞানীগণ মস্তিষ্ককে টেলিভিশন যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন এবং বুদ্ধিকে প্রেরণকেন্দ্রের সঙ্গে। টেলিভিশনে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে, তার বাহনকৃত বিষয়টি কখনো বিকৃত হয়ে পড়ে, কখনো না একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই যখন বলা হয় যে, মস্তিষ্কই সবকিছু– এমন ধারণা একটি সরলীকৃত বক্তব্য। এ যেন পুরোপুরি সেই ছোট্ট শিশুর মতো, যে ভাবে যে টেলিভিশনের পর্দায় যে সমস্ত দৃশ্য ও ব্যক্তির প্রকাশ ঘটছে, সবই এই বাক্সের অন্তর্গত।

এটা তো স্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ ধর্মীয় নির্দেশনা ব্যতীত তা অসমাধেয় মৌলিক সমস্যা হিসাবে প্রতিভাত হবে। যতই তাতে জীবতাত্ত্বিক (biology) ও অঙ্গতাত্ত্বিক (organology) বিষয়-আশয় থাকুক না কেন। যদিও দার্শনিক, ধর্মীয় ও মনোগত দিকের তুলনায় একে বেশ সহজ বলে মনে হয়। তবে বাস্তবতা হল, এর গূঢ়তা, জটিলতা কোনো অংশেই কম নয়। বরং কখনো কখনো এগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়। স্নায়ুতন্ত্র-বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মানব-মস্তিষ্কই আল্লাহর প্রশস্ত জগতে সবচে' জটিল। যেমন Uttal তার মূল্যবান গ্রন্থ[৬] (The Psychobiology of the Mind)-এ লিখেন যে, মানব-মস্তিষ্কের কর্ম-প্রক্রিয়ার পরিচিতির জন্য যত সমস্ত আবিষ্কার এবং আধুনিক গবেষণার উদ্ভব ঘটেছে, এর কোনোটাই বুদ্ধির সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বিষয়ে মানব-ইতিহাসের যে জটিলতা রয়েছে, এর সমাধানে ন্যূনতম সহায়তা করতে পারে নি। বরং এই সমস্ত তথ্যাদির প্রেক্ষিতে উত্থাপিত বিষয়গুলো ভিন্নরকম প্রশ্নের রূপ নিয়েছে। একান্ত মৌলিক প্রশ্ন হিসাবে এ্যারিস্টটলের সময়ে যা উত্থাপিত হয়েছিল, দু-হাজার বছরের অধিক সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো তা সন্তোষজনক উত্তরের অপেক্ষায়। আমরা এখন যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম উপকরণ আবিষ্কার করেছি; তা সত্ত্বেও, মস্তিষ্ক যে প্রক্রিয়ায় মানুষকে চেতনা ও মৌলিক অনুভূতি প্রদান করে, তা আমাদের অজানা। অথচ মানুষ যা কিছুর স্বত্বাধিকারী– তার মাঝে এটাই সবচেয়ে মূল্যবান।[৭]

এই অবস্থা-ই মূলত আল্লাহর সৃষ্টিজগত বিষয়ে ভাবতে, অভিচিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে। চিন্তা ও ভাবনার প্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। সেই সঙ্গে মানুষের উপর এই চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক, আত্মিক ও আচরণিক প্রভাব সম্পর্কেও। সুদানীয় কবি আল-তাজানি ইউসুফ বশির তার "বাস্তবতার বার্তাবাহীগণ" কবিতায় বুদ্ধিকে সম্বোধন করে যা বলেন, তা একান্ত সত্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন :

"প্রভু, তোমার সন্তুষ্টি দাও আমাকে। তোমার কুদরতি হাত কোত্থেকে নির্মাণ করল ঢেকে রাখা গোপন রহস্য, যা জীবনের সূচনাকাল থেকে তোমার কাছে বুদ্ধি নামে পরিচিত। জীবনকে যে পরিচালিত করে, বিন্যস্ত করে। প্রভু, তোমার সন্তুষ্টি দাও

---

[৬] W. Uttal, 'The Psychobiology of the Mind', John, London, 1978.

[৭] পূর্বোক্ত।

আমাকে। বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী হয়ে যে আত্মপ্রকাশে উদ্যোগী হয়, তার অস্তিত্ব গুপ্ত হয়ে পড়ে। কালের সম্মানকে উৎসর্গ করব নাকি মূল বস্তুর ছায়াকে? হে বুদ্ধি, হে বুদ্ধির সংশয়, তুমিই কি একমাত্র উপযুক্ত নও? তুমি কি একমাত্র শক্তি নও যা জীবনকে ধ্বংস করে, পরে নির্মাণ করে, কখনো কখনো সৃষ্টিজীবনকে করে তোলে উড়ন্ত ধুলোর মতো।"[৮]

সমস্যার এই জটিলতা সত্ত্বেও জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের গবেষকগণ মানুষের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধি ও চিন্তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গুপ্ত বিষয়ের অনেক কিছুই জানতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সঙ্গে বুদ্ধি ও চিন্তার সঙ্গে ভাষার সূক্ষ্ম-সম্পর্কের সূত্রও। আধুনিক বৈদ্যুতিক গণিতবিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তারা এমন কিছু বিস্তৃত প্রোগ্রাম নির্মাণে সক্ষম হন, যা তথ্য-সন্নিবেশের ক্ষেত্রে মানব-বুদ্ধি যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে; তাকে স্পষ্ট করে তোলে। যেমন এটা স্পষ্ট যে, ভাষা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্বোধনের মাধ্যম মাত্র নয়। বরং একটি মৌলিক শৃঙ্খলা-বিশেষ, যা মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে উপায়-পদ্ধতি অনুভূত বা আকারহীন অর্থকে শব্দের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে চলে, তার উপস্থিতি ব্যতীত শূন্য ধারণা-নির্মাণে, নিজ শক্তিতে অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে কর্ম-প্রক্রিয়ায় এবং বর্তমানের সঙ্গে এর সম্পৃক্তকরণে, ভবিষ্যতের কর্ম-পদ্ধতিতে ফলপ্রসূ পথ নির্মাণে চিন্তন, স্মরণ ও অনুভব শক্তি থেকে প্রার্থিত উপকারিতা অর্জন করতে পারবে না। সম্মুখস্ত সমস্যাবলির উপযুক্ত সমাধানেও সক্ষম হবে না। চিন্তন-প্রক্রিয়া মূলত এই সমস্ত প্রতীকগুলোকে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার নামান্তর।

বরং কোনো কোনো বিজ্ঞানী, যেমন Whorf যিনি -Linguistic Relativity Hypothesis (ভাষাতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতবাদ) মতবাদে বিশ্বাসী– এর মতে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যে ভাষা ব্যবহার করে, তার বৈশিষ্ট্যই ঐ ভাষাগোষ্ঠীর চিন্তার উপায়-মাধ্যমগুলোকে সীমায়িত করে দেয়; তার যে জীবন-বাস্তবতা, তা ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ তাদের মতে, ভাষিক সংগঠন এবং ভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য– সবই সমাজের যাপিত জীবনের প্রকৃতিকে মূর্তায়িত করার মৌলিক প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে।

ভাষার গুরুত্ব বোঝার জন্য আমরা এই মতবাদটা স্পষ্ট করে নিতে পারি। কারণ তা যদি খণ্ডিত বা অখণ্ডভাবেও সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর টানেই আমাদেরকে আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবতে হবে। আরব উপদ্বীপের সমাজ-জীবনে এর কী প্রভাব, তাও ভাবতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজ ওহি, কুরআন এবং সর্বোপরি সকল মানুষের জন্য ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য একেই নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এই ওহির সংরক্ষণ মানেই হল আরবি ভাষার সংরক্ষণ। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এভাবেই কুরআনের অলৌকিকত্ব স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে থাকবে।

---

[৮] আল-তাজানি ইউসুফ বশির, 'ইশরাকাহ', দার আল-সাকাফা, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রি, পৃ : ১৪-১৫।

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর সংরক্ষক।" (আল-হাজার : ৯)

এই প্রেক্ষিতেই আল-আক্কাদ আরবি ভাষার সংগঠন, ধ্বনি মাধুর্য ও সুর বৈচিত্রের বর্ণনা দেন এই ভাষায় :'

"মানুষের বাকযন্ত্র পরিপূর্ণ সাঙ্গীতিক মাধ্যম। প্রাচীন এবং আধুনিক কালে অন্য কোনো জাতিই আরবজাতির মতো এই মাধ্যমকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। কারণ বর্ণবিভাজনের ক্ষেত্রে সে ধ্বনিতাত্ত্বিক সকল গুণাবলি থেকেই উপকৃত হয়েছে।"[৯]

আক্কাদের বিশ্বাস, "আরবি ভাষার এই বৈশিষ্ট্যই কবিতাকে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।"[১০] যা আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় সহজলভ্য নয়। এ জন্য আক্কাদ আরো বলেন, "শব্দ এবং বর্ণের সাহায্যে মানুষ যতটুকু নিজ সম্পর্কে প্রকাশ করতে পারে, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আরবি বাগ্মিতা এর শীর্ষচূড়ায় পৌঁছেছে।"[১১]

এ জন্য "সেমিটিক ভাষার বিস্তৃত ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক আর্নেস্ট রেনান আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের বহনে এর প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি যে বিস্ময়-বাক্য উচ্চারণ করেন, তা জেনে নিতে পারি। তিনি বলেন:

"একটি যাযাবর জাতির মুখে বিশাল মরু-প্রান্তরে একটি শক্তিমান ভাষার জন্ম এবং সেই সঙ্গে এর অস্বাভাবিক পূর্ণতা– সবই অবাক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই ভাষা শব্দের সংখ্যাধিক্য, অর্থের সূক্ষ্মতা এবং সুষম গঠন ও নির্মাণের দিক থেকে সমপর্যায়ের সকল ভাষাকে অতিক্রম করে যায়। এই ভাষাতো পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যখন এর পরিচয় উদঘাটিত হল, তখন তা পূর্ণতার অলঙ্কারে সজ্জিত, অথচ এতে পরিবর্তন বা বিবর্তনের ন্যূনতম স্পর্শ লাগে নি। এমনকি এই ভাষা-জীবনের কোনো স্তর-বিন্যাস নেই। নেই শৈশব বা বার্ধক্য। অপ্রতিরোধ্য বিজয় ও অভিযান ছাড়া এর বিষয়ে কিছু জানা যায় না। গবেষকদের সামনে ক্রমবিবর্তনহীন পরিপূর্ণ একটি ভাষার সমতুল্য আর কোথাও চোখে পড়ে নি এবং যা আজও সকল বিবর্তন ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত।

এক সময় আরবি ভাষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং দূর-দূরান্তের দেশ ও নগরে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১২]

---

[9] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, 'আল-লুগাহ আল-শায়িরাহ', গারিব লাইব্রেরি, পৃ : ১৬।

[10] পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০।

[11] পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০।

[১২] আর্নেস্ট রেনান, আনওয়ার আল-জুনদি রচিত 'আল-ফুসহা লুগাহ আল-কুরআন' গ্রন্থে উল্লিখিত, দার আল-কিতাব আল-লুবনানি, ১৯৭২, পৃ : ২৭।

চিন্তন-প্রক্রিয়ার মৌলিক শৃঙ্খলা হিসাবে ভাষার গুরুত্ব-বিষয়ক অপ্রয়োজনীয় আলোচনার পর আমরা মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, যেখানে তারা মানুষের অভ্যন্তরীণ জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও তৎপরতা বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী ও সচেষ্ট। তাই দেখতে পাই যে, তারা এখানে কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে জড়িয়ে যাচ্ছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানী ও কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞগণ স্মৃতিতে তথ্য-সংকলন, সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতার পরিধি এবং প্রয়োজনমতো তা ব্যবহারের দক্ষতা বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। চিন্তন-ক্রিয়া ও সমস্যা-সমাধানে মানুষ যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে, এর পরিচয় উদঘাটনের জন্য তারা অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করেই তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম নির্মাণ করেছেন, যা মানুষের কাছে জ্ঞানতাত্ত্বিক তৎপরতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বরং কেউ কেউ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মানসিক রোগী ও মনোবৈকল্যগ্রস্থরা যে চিন্তা-পদ্ধতি অনুসরণ করে, এর প্রকাশের জন্য একটি প্রোগ্রাম নির্মাণ করেছেন। সন্দেহ নেই, এই সমস্ত গবেষণা সেই সব দিকগুলোর দরোজা খুলে দিয়েছে, যার বিষয়ে আচরণবাদীগণ বলতেন যে, তা হল একটি তালাবদ্ধ বক্স, এর অভ্যন্তরে প্রবেশের কোনোই সুযোগ নেই। তেমনি তা অনেক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেছে, যা উদ্দীপক ও আলোড়নের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককে সহজ কল্পনার সাহায্যে উদঘাটনে অক্ষম ছিল। মুসলিম মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের জন্যও একটি জানালা খুলে দিয়েছে, যাতে তারা ইবাদত হিসাবে চিন্তন-অভিচিন্তনের গুরুত্ব এবং এর পরিপার্শ্বিক অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে পারেন।

এই সমস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক পাঠ-গবেষণার মাধ্যমেই ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের অভ্যন্তরীণ চিন্তন-প্রক্রিয়া, তার অনুভব-অনুভূতি ও কল্পনার উপায়-স্বরূপ জানতে পারেন, যা তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আচরণবাদীগণ মানুষের ব্যক্তি-নির্মাণের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক আচরণের বিশ্লেষণে উদ্দীপক নানা উপাদানসহ পরিবেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে পরিবেশের উদ্দীপক উপাদানই সরাসরি আচরণিক আলোড়নকে প্রতিফলিত করে। অবশ্য জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ উদ্দীপক উপাদানগুলো মানুষের মাঝে যে অর্থে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাকেই অধিক গুরুত্ব দেন। উদ্দীপক উপাদান সরাসরি আলোড়নকে বাধ্য করে না। তবে তা শুধু জাড্য ইচ্ছাবহির্ভূত প্রতিবিম্বিত অবস্থার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন উষ্ণতার স্পর্শে হাত গুটিয়ে যায়। গূঢ় আলোড়নের ব্যাপারটি মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুগত সিদ্ধান্ত, প্রকাশ্য আচরণ এবং গভীরের বিশ্বাস– সব কিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। তখন রূপ ধারণ করে ভাবনা, অর্থ, পরিবেশ-পরিস্থিতি কেন্দ্রিক উদ্দীপনা,

অনুভূতি থেকে উদ্ভূত পূর্বাজ্ঞিতা। অন্যকথায়, মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, তাই তার বিশ্বাস ও আচরণে প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন তার ভাবনা হবে আল্লাহর সৃষ্টি-কৌশল ও তার নেয়ামত বিষয়ে, তাতে তার ইমান-বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, কার্যকরী এবং আচরণিক উন্নতি ঘটবে। যদি তার চিন্তা নিবদ্ধ থাকে আপন স্বার্থ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে, তাহলে তা তাকে ধর্মচ্যুত করবে এবং আচরণিক অবনতি ঘটবে। যদি তার ভাবনা নিবদ্ধ থাকে ভীতিকর বিষয়ে, অবনতি-পরাজয় ও দুর্ভাগ্য বিষয়ে; তাহলে তা তার আলোড়ন-কেন্দ্রিক দুশ্চিন্তার সমস্যা এবং অন্যান্য মানসিক রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ চিকিৎসা-ক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতিকেন্দ্রিক চিন্তা-পরিবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ সেই চিন্তন-প্রক্রিয়া যা সাধারণত সুস্থ-অসুস্থ, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকদের কাছে প্রতিক্রিয়ামূলক আলোড়নকে অতিক্রম করে যায়। অধিকাংশ সময়ই যখন দ্রুত গতিতে সরাসরি এই জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তন-প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে, তখন দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও গভীর না হলে স্বাভাবিকভাবে নজরে তা পড়ে না।

এই সমস্ত বিশেষজ্ঞগণ এটা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ স্বেচ্ছায় যে কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তার পেছনে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তন-প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে। মনুষ্য-বুদ্ধি রাত ও দিনের কোনো একটি মুহূর্তেও চিন্তন-প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকে না– চাই তা সচেতনভাবে হোক, অথবা অবচেতনভাবে। অনেক সময়ই মানুষ একটি গূঢ় সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিরত থাকে, যখন সমাধানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তা পরিত্যাগ করে, অন্য একটি কর্ম-প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখনই– হঠাৎ অবচেতনভাবেই সেই সমস্যার বিশুদ্ধ বা প্রত্যাশিত একটি সমাধান বের হয়ে পড়ে। এর একটি ধ্রুপদী উদাহরণ অ্যারিসমেডিস কর্তৃক হঠাৎ শূন্যে ভাসমানতার তত্ত্ব আবিষ্কার। তেমনি যে ব্যক্তি কারো নাম বা নির্দিষ্ট একটি শব্দ স্মরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে, সামান্য পরেই তা তার স্মরণে আসে আকস্মাৎ; যা পূর্ববর্তী উদাহরণের মতোই।

সুতরাং মানুষের অভ্যন্তরীণ চিন্তন-প্রক্রিয়া ব্যক্তির অনুভূত হোক না হোক– তা তার আচরণকে নির্দেশ করে, বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের আচরণকে ব্যাপক ধারণাসহ একটি সীমিত তত্ত্বের মাঝে সিপি-আঁটা করবার জন্য সকল ঘরানা (School) দীর্ঘদিন যাবৎ যে গবেষণা করে আসছে, সে বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের এটাই হল সার-নির্যাস। এই সার-নির্যাস ইসলাম নির্ধারিত পদ্ধতিকেই সত্যায়ন করে যে, আল্লাহর সৃষ্টজীব বিষয়ে অভিচিন্তনই ঈমানের মূল মেরুদণ্ড, যার থেকে সকল উত্তম কর্মের উদ্ভব ঘটে থাকে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই যে, সকল কাজের সূচনা-ই ঘটে থাকে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যেমন মনোকথা, ধারণা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও

প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। তেমনই তাদের সিদ্ধান্ত যে, এই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার শক্তি যখন বৃদ্ধি পায়, তখনই তা আচরণের উদ্‌গাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ব্যক্তি যখন আচরণের জন্ম দেয় এবং তার পুনরাবৃত্তি করে, অভ্যন্তরীণ চিন্তা-শক্তি তখনই সরাসরি এই কর্ম বাস্তবায়নের শক্তি অর্জন করে। আর এভাবেই তা সুদৃঢ় অভ্যাসে পরিণত হয়। জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানীগণ যখন এই সমস্ত অভ্যাসের চিকিৎসায় নিয়োজিত হন, পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন; তখন তাঁদেরকে অভ্যন্তরীণ চিন্তা-প্রক্রিয়া ও অনুভূতি-তলকে পরিবর্তনে সচেষ্ট হতে পবে প্রথমেই। তার অভ্যাস যদি হয় উদাহরণত সামাজিক অবস্থানের আশঙ্কা, তাহলে চিকিৎসককে অভ্যন্তরীণ সেই চিন্তা-প্রক্রিয়ার উপর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, যা সামাজিক ভীতি থেকে জন্ম লাভ করেছে এবং রোগীকে এর পরিবর্তনে সহায়তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক এবং কার্যকরী পদ্ধতিতে। যেন রোগীর জন্য এটা প্রতিভাত হয় যে, এই সমস্ত চিন্তা-প্রক্রিয়ার বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নেই, বরং সবই ভাসা ভাসা ধারণা ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত– শরীরের সুস্থতায় যার ন্যূনতম নির্ভরতা নেই। অবশ্য রোগীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা এ বিষয়ে এতটায় দৃঢ়তা লাভ করেছে যে, তা তার আচরণে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে। কখনো কখনো রোগী ভাবে যে, যদি সে অন্যের সামনে কথা বলে বা অপরিচিতের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে; তাহলে সে ঠাট্টা বা উপহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে, অথবা সে যদি একদল মানুষের সামনে বক্তব্য প্রদান করে, তখনও এমন হতে পারে। কিন্তু যখন তার অভ্যন্তরীণ চিন্তা-প্রক্রিয়ার পরিবর্তিত হবে, তখন তার আচরণও সে অনুসারে পাল্টে যাবে।

তেমনিভাবে এই মনোচিকিৎসা অভ্যাসগতভাবে প্রোথিত পারস্পরিক বিরোধী অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া, ধারণা ও চিন্তাধারার আলোড়নের উপাদানগুলোকে জাগ্রত করে দেওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। যদি সামাজিক অবস্থান থেকে ভীতি-সঞ্চারের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে চিকিৎসক রোগীর অনুভবে প্রশান্তি ও মানসিক স্বস্তি ফিরিয়ে দেবেন সময়োপযোগী পদ্ধতিতে, ক্রমোন্নীত দৃঢ়ীকৃত সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে। হয়ত সামাজিক বাস্তবতার সত্যতা স্পষ্ট করে অথবা তার ধারণাস্থিত পথের দিক থেকে। কিন্তু ব্যক্তি যদি স্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়, মানসিক আনন্দোপভোগে উৎসাহী হয়; তখন চিকিৎসককে এর তীব্র বিরোধী উপাদানের সাহায্যেই চিকিৎসা সম্পন্ন করতে হবে। পুনরাবৃত্ত অভ্যাসের মূলোৎপাটনের জন্য চিকিৎসক রোগীর মনে কষ্ট, ভীতি ও মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাবেন। যেমন মাদক-দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে রাসায়নিক উপাদানের মাধ্যমে ইনেজকশন দেবেন, মদ্য পানের বেলায় যা তার বিতৃষ্ণার এবং অনীহার উদ্রেক করবে। তেমনি তাকে বেদনাদায়ক ইলেট্রিক শকও দেওয়া যেতে পারে। একে বলা হয়, বিপরীত বা বিরোধী উপায়ে চিকিৎসা-প্রদান (Reciprocal Inhibition)। এটাই আধুনিক আচরণবাদীদের সমর্থিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসা পদ্ধতি যদিও আচরণবাদীগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত, কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক

মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ এর উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, রোগীর অনুভব-অনুভূতি ও চিন্তা-প্রক্রিয়াকে পারিপার্শ্বিকতাসহ গভীরতা দান করেছেন। আবার জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞগণ মনোরোগীর অভ্যাসগুলো পরিবর্তনের লক্ষ্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-আচরণের উৎস হিসাবে যা মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, সেই ভ্রান্ত মূল্যবোধগুলো এবং চিন্তা-প্রক্রিয়ার পরিচয় লাভের জন্য ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

সুতরাং বলা যায় যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান মানুষের কল্পনা, ভাবনা, প্রতিক্রিয়া এবং অনুভূত পর্যায়ের উপরই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এই অনুভূত স্তরই জীবনভিত্তিক কল্পনাধারাকে রূপায়ণ করে, তার বিশ্বাস-মূল্যবোধ নির্মাণ করে এবং তার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বহির্ভূত আচরণকে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

চিন্তন-ক্রিয়া ও অভিচিন্তন

মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং চিন্তন-ক্রিয়ার বিষয়ে মনোবিজ্ঞান যে উন্নতির স্তরে পৌঁছেছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছি। যেন মানুষের ইমান-বিশ্বাসের উন্নয়নে এবং আচরণিক নির্দেশনায় ইবাদত হিসাবে অভিচিন্তনের গুরুত্ব ফুটে ওঠে। অনুভব, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ধারণা ও কল্পনা-সম্পৃক্ত অভ্যন্তরীণ চিন্তন-ক্রিয়া ব্যক্তির আচরণ নির্মাণে; তার প্রবণতা, বিশ্বাস, সচেতন ও অবচেতন উৎসাহ এবং সৎ-অসৎ অভ্যাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে আল-কুরআন ও সুন্নাতে নববী নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে ভাবনা ও চিন্তন-কল্পনার জন্য যে গুরুত্ব দিয়েছে– যে চিন্তন-ক্রিয়ায় হৃদয়-মন ভরে উঠবে আল্লাহর মহত্ত্ব, মাহাত্ম ও অনিন্দ্য গুণাবলির প্রভাবে– তাতে এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার নানা দিক স্পষ্ট হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তো বলেন যে, "চিন্তা-গবেষণাই হল সকল কল্যাণের চাবিকাঠি, মূল উৎস; হৃদয়-মনের কর্মকাণ্ডের মাঝে সবচে' উত্তম এবং উপকারী।"[১৩] এখানে আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে, চিন্তন-ক্রিয়ার ব্যাপারে জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান যে অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, তা প্রাচীন মুসলিম বিশেষজ্ঞদের নিকট অজানা ছিল না। চিন্তা এবং হৃদয়বাহিত কল্পনা মস্তিষ্কে আবর্তিত হতে থাকে ঝোঁকে রূপ নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং প্রবৃত্তিতে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত– যে প্রবৃত্তি বাস্তব জীবনে ব্যক্তির কর্ম বাস্তবায়নে অধিকতর শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, পুনরাবৃত্তির ফলে যা অভ্যাসে পরিণত হয়। তেমনি মানুষের অভ্যন্তরীণ চিন্তা-প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মানসিক এই প্রক্রিয়া জীবনের কোনো সময়েই ব্যাহত হয় না। কর্ম যেন সৎ ও শুদ্ধ হয়– এ কামনা যাদের, তাদের প্রতি সনিষ্ঠ উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে, তারা যেন চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে সচেতন থাকেন এবং সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখেন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলসহ আল্লাহর সৃষ্ট জীবে চিন্তন-ক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। যখন তার চিন্তা ও ধারণা একটি বিষয়ে নিবিষ্ট হবে, তখনই বাণী-বক্তব্য ও কর্মের মাঝে তা ফুটে উঠবে। তারা এটা বেশ জোর দিয়ে বলেন যে, প্রবৃত্তি এবং ঝোঁক হিসাবে রূপ নেওয়ার পূর্বেই ক্ষতিকর চিন্তা-চেতনা থেকে বিরত থাকা যে কোনো ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত সহজ। তারা আরো বলেন যে, যদি কোনো বাস্তবে রূপ নেই, তা স্থগিতকরণের চেয়ে এর ঝোঁককে পরিবর্তন অত্যন্ত সহজ। তেমনি কোনো কর্ম অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় পূর্বে এর মূলোৎপাটন সহজ। অভ্যাসের নিরাময় হতে পারে ব্যক্তিকে বিরোধী-বিপরীত কর্মের তাপ দিয়ে। এসব কিছুর বর্ণনাই ইবনুল কাইয়ুম 'আল-ফাওয়াইদ' গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে

---

[১৩] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়্যা, 'মিফতাহ দার আল-সায়াদাহ', প্রথম খণ্ড, পৃ : ১৭৩, ইফতা বোর্ড, রিয়াদ।

বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যেন জ্ঞানতাত্ত্বিক আধুনিক মনোবিজ্ঞানের শেষ কথাটুকুই বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়ুম বলেন[১৪] :

"কল্পনাকে দূরে রাখো, না হয় তা চিন্তার রূপলাভ করবে। চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখো, না হয় তা প্রবৃত্তির রূপ নেবে। প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করো, না হয় তা প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা হিসাবে আবির্ভূত হবে। যদি এই ইচ্ছাকে বিনষ্ট না করা যায়, তা কর্ম হিসাবে রূপ লাভ করবে। কর্মকে যদি বিপরীত কর্ম দিয়ে মোকাবেলা করা না যায়, তাহলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে। অভ্যাসের পরিবর্তন বেশ জটিল বিষয়।

জেনে রাখা উচিত, ঐচ্ছিক সকল কর্মের মূল উৎস হল হৃদয়-বাহিত কল্পনা ও চিন্তা। এই কল্পনা ও চিন্তার ঘূর্ণনই বাসনার জন্ম দেয়। হৃদয়-কামনাই কর্মকে বাস্তবায়িত করে। কর্মের পুনরাবৃত্তিতে অভ্যাসের জন্ম হয়। এই সকল স্তরের সংশোধন হতে পারে চিন্তা ও কল্পনার সংশোধনের মাধ্যমে। চিন্তা ও কল্পনার বিনষ্টি সব কিছুকেই নষ্ট করে ফেলে।

হৃদয়-মনের সুস্থতা তো তখনই সম্ভব, যখন তা এর প্রভু এবং মালিকের দৃষ্টিসীমায় থাকবে। তার দিকেই উত্তরণ ঘটবে, তারই সন্তুষ্টি ও ভালবাসার টানে। কারণ সেই প্রভুর সাহায্যেই সকল সুস্থতার জন্ম হয়, তাঁর থেকেই সকল হেদায়েত উদ্ভূত হয়; তাঁর সহায়তায়ই সুপথের উৎপত্তি, তাঁর তত্ত্বাবধানেই সকল কিছুর সংরক্ষণ হয়ে থাকে। মানুষ যদি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিরত থাকে; তা পথভ্রষ্টতার সৃষ্টি করে।

জেনে রাখা উচিত যে, কুমন্ত্রণা এবং কুবুদ্ধি সংশ্লিষ্টদেরকে চিন্তন-ক্রিয়ার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। চিন্তন-ক্রিয়া স্মৃতিতে মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কজাত ভাবনা ইচ্ছা-শক্তির জন্ম দেয়। ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর বর্তায়, যা বাস্তবে কর্ম রূপায়িত করে। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তি যখন দৃঢ়তা লাভ করে, তখন তা অভ্যাসে পরিণত হয়। পরিপূর্ণ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার পর উৎপাটনের চেয়ে শুরুতেই সমূলে উৎপাটন করা অনেক সহজ।

এটা তো সর্বজন বিদিত যে, মানুষকে কল্পনা অকেজো করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। এই কল্পনাকে ছিন্ন করার সুযোগও দেওয়া হয় নি। কারণ তাতো তাকে মানসিক দিক থেকেই আক্রমণ করে। বৌদ্ধিক এবং ঈমানি শক্তিই উত্তম কল্পনাকে গ্রহণ করার, এতেও সুস্থির-সন্তুষ্ট থাকার এবং অধম কল্পনাকে প্রতিহত করার, ঘৃণা ও বর্জন করার সাহস যোগায়।

---

[১৪] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'আল-ফাওয়াইদ', মিশরীয় প্রকাশনী, ১৩৪৪ হিজরি, পৃ : ৩১, ১৭৩।

আল্লাহ মনকে একটি সদা অস্থির গোলাকার পেষণযন্ত্রের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। এতে সব সময় পেষ্য বস্তু রাখতে হয়। এতে শস্য রাখলে যেমন তা পেষণ করবে, তেমনি যদি মাটি বা কাঁকর রাখা হয়, তখনও পেষণ করবে।

মনে যে সমস্ত চিন্তা-ফিকির ঘুরতে থাকে, তা যেন পেষণযন্ত্রে রাখা শস্যের মতো। এই পেষণযন্ত্র কখনোই কর্মহীনভাবে থাকে না। এতে কিছু না কিছু রাখতেই হয়। কতিপয় মানুষ শুধু তার পেষণাযন্ত্রে শস্য রাখতে পারে, যা সবার উপকারী ময়দা হিসাবে বের হয়। অধিকাংশ মানুষজনই বালি-কাঁকর ও খড়কুটো ইত্যাদি পেষণ করে থাকে। যখন ভিজানো ও রুটি বানানোর সময় আসে তখনই মানুষজন তার পেষণের বাস্তবতা জানতে পাবে।" (ইবনুল কাইয়ূমের বক্তব্য এখানেই শেষ।)

আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আচরণবাদী চিকিৎসা-পদ্ধতি যে উন্নত অবস্থানে পৌঁছেছে, তাতে চিন্তা-ফিকির এবং প্রতিক্রিয়ামূলক অসুস্থতার চিকিৎসায় সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি হল বিপরীত উপাদানগুলোকে আলোড়নের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা। অবশ্য তা হতে হবে ক্রম-বিন্যাসের পদ্ধতিতে, যেমন তা বিপরীত উপদানের চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট। ইবনুল কাইয়ুমও কিন্তু তার গ্রন্থাদিতে একাধিক জায়গায় বিপরীত উপায়ে চিকিৎসা দানের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং জোর তাগিদ দিয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালি র. শুধু তত্ত্ব আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন নি, এর প্রায়োগিক দিকেও অগ্রসর হয়েছেন; এর জন্য নানা রকমের বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি তাঁর 'ইহ্য়াউল উলুম' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "যে মুসলিম নিজ চরিত্রকে সুন্দর দেখতে চায়, তার উচিত প্রথমেই নিজ উদ্যোগে চিন্তন-ক্রিয়াকে পরিবর্তন করা। এরপর ক্রমান্বয়ে উত্তম চরিত্রের নানা উপাদানের বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। আর এভাবেই তার অভ্যাস তৈরি হবে।" গাজ্জালি বিশেষ করে তাগিদ দেন–আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের মতোই– "মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় ও বাস্তবিক আচরণের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া একটি অপরিহার্য বিষয়। ব্যক্তি যখন সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক আচরণের প্রকাশ ঘটাবে– হোক না অনিচ্ছাজনিত– তখন এর প্রভাব তার চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। যখনই সে তার চিন্তা-ধারা ও অনুভব-অনুভূতিকে পরিবর্তন করবে, তার বাহ্যিক আচরণও পরিবর্তিত হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাবে।" ইমাম গাজ্জালি থেকে সরাসরি এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

"এটা তোমরা নিশ্চয় জানো যে, এই সমস্ত উপাদান চর্চার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র অর্জিত হতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে সূচনায় উদ্ভূত সকল আচরণই যেন চূড়ান্তভাবে অভ্যাসে পরিণত হয়। এ হল হৃদয় ও মনের সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবাক-করা সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শরীর ও মনের সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ হৃদয়ে যে গুণের প্রকাশ ঘটে, তার প্রভাব অঙ্গ-প্রতঙ্গে পড়ে। তাই দেখা যায়, অন্তরের সম্মতি ব্যতীত

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো রকমের আলোড়ন হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে আচরণ ও কর্মের প্রকাশ ঘটে, তার প্রভাব অন্তরে পৌঁছুয়। বলা যায় এ এক অচ্ছেদ্য চক্র।"[১৫]

বিপরীত পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান এবং এই চিকিৎসার প্রয়োগের বিষয়ে ইমাম গাজ্জালি র. খুব সংক্ষেপে, স্পষ্ট ভাষায় এবং সূক্ষ্ম উদাহরণের মাধ্যমে যা বর্ণনা করেন– তাই তো জ্ঞানতাত্ত্বিক আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন :

"শরীরের সুস্থতা বিনষ্টকারী যে কোনো ব্যাধির চিকিৎসা শুধুমাত্র তার বিপরীত উপাদানের প্রয়োগেই সম্ভব হতে পারে। যদি ব্যাধি হয় উষ্ণতা ও তাপসংশ্লিষ্ট, এর নিরাময় হবে শীতলার মাধ্যমে। যদি ব্যাধি হয় শীতলতা ও হিমেলসম্পৃক্ত, এর নিরাময় ঘটবে উষ্ণতা ও তাপ-প্রবাহে। তেমনিভাবে অন্তঃস্থ ঘৃণিত ব্যাধির নিরাময় করতে হবে তার বিপরিত উপাদানের মাধ্যমে। যেমন- অশিক্ষার ব্যাধি দূর হবে শিক্ষার আলোতে, কৃপণতার ব্যাধি দূর হবে বদান্যতায়, অহংকারের ব্যাধি নম্রতায়, মোহের ব্যাধি মোহিত বস্তু থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হতে হবে।

চর্যা-অনুশীলনের একটি গোপন কথা এই, শিষ্য-অনুসারী যদি কোনোভাবেই কু-অভ্যাসের পরিবর্তনে সম্মত না হয়, বা অন্য কোনো গুণের পরিবর্তনে এগিয়ে না আসে, এমনকি বিপরীত উপায় ব্যবহারের কোনো সুযোগ না দেয়, তাহলে গুরু-শিক্ষক তাকে ক্রমান্বয়ে গভীর কোনো ঘৃণ্য আচরণ থেকে হালকা ঘৃণ্য আচরণে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর তা হবে যেমন রক্ত পরিস্কারের জন্য প্রস্রাবের ব্যবহার, যদি পানির মাধ্যমে তা দূর না হয়। পরে প্রস্রাব পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে।"[১৬]

ইমাম গাজ্জালি এ বিষয়ে এমন এক ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করেছেন, যে কি-না ভীষণ ক্রুদ্ধতার জন্য নিরুপায়। তাকে ক্রমান্বয়ে ধৈর্য্যের অনুশীলন করাতে হবে, চিন্ত ন-ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে। তেমনি বাস্তব জীবনে প্রায়োগিক অনুশীলনের মাধ্যমে। ইমাম গাজ্জালি র. এর চরম পর্যায়টুকু এভাবে বর্ণনা করেন যে, "জনসমক্ষে যে তাকে গালমন্দ করবে, তাকে সে এর জন্য প্রণামী দেবে, নিজেকে ধৈর্য্যের জন্য প্রস্তুত করবে, নিজ-ক্রোধ সংবরণ করবে। এভাবেই ধৈর্য্য তার অভ্যাসে পরিণত হবে। এক সময় তার উদাহরণ মুখে মুখে ফিরবে।"[১৭]

এতে স্পষ্ট হয় যে, অভিচিন্তন এবং এর আনুষাঙ্গিক স্মৃতি-সচেতনতা– সবই মুসলিমের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, ক্রমান্বয়ে এর মাধ্যমে তার আচরণ ও অভ্যাসের

---

[15] আবু হামিদ আল-গাজালি, 'ইহ্য়াউ উলুম আল-দিন', দার আল-কলম, বৈরুত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ : ৫৬-৫৯।

[16] পূর্বোক্ত।

[17] পূর্বোক্ত।

পরিবর্তনের প্রস্তুতির জন্য মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে। এই পরিবর্তন ব্যতীত আচরণ ও অভ্যাসের সংশোধন অসম্ভব।

তাই অভিচিন্তনই সকল কল্যাণের মূল চাবিকাঠি। এটাই রাঙিয়ে তোলে আল্লাহর স্মরণে উদগ্রীব, তাঁর নেয়ামতের পরিচয় গ্রহণে আগ্রহী মোমিন-বিশ্বাসীর জ্ঞানতাত্ত্বিক সকল প্রণোদনাকে। যেমন ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন: "আল্লাহর পরিচয় লাভের উপায় হল তার সৃষ্টজীবকে সম্মান করা, তাঁর সৃষ্টি-কৌশলে চিন্তন-ক্রিয়া অব্যাহত রাখা, সৃষ্টিকূলের বৈচিত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করা। এর কারণেই বিশ্বাসের গভীরতা সৃষ্টি হয়। এ বিশ্বাসের স্তরায়ণেই বিশ্বাসীর স্তর-বিন্যাস নির্ধারিত হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালাই বুদ্ধির সৃজনকর্তা, ওহি-প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি এর সুপথ প্রাপ্তিকে পূর্ণতা দান করেছেন। বুদ্ধিমানদের নির্দেশ দিয়েছেন সৃষ্টিজগতে দৃষ্টি ফেরানোর, অভিচিন্তনের; সৃষ্টি-বৈচিত্রে যে বিস্ময়ের সংকলন করেছেন, তা থেকে উপদেশ গ্রহণের।"[১৮]

এটা তো স্পষ্ট যে, এ ধরনের অভিচিন্তন মুমিন-বিশ্বাসীর চিন্তাগত, অনুভূতিগত, প্রতিক্রিয়াগত ও ইন্দ্রিয়গত দিককে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ তা তার আত্মিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক– সকল প্রণোদনা ও উদ্যমকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এও তো অসম্ভব যে, কেউ আল্লাহকে স্মরণ করবে অথচ তাঁর সৃষ্টি-জগতের ব্যাপারে অভিচিন্তনে লিপ্ত হবে না অথবা আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে ভাবিত হবে অথচ আল্লাহর স্মারকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

যেমন- হাসান বাসরি র. বলেন যে, "জ্ঞানীগণ সর্বদা আলাহর স্মরণের মাধ্যমে চিন্তন-ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হন, তেমনি চিন্তন-ক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করে থাকেন। হৃদয়ের সঙ্গে যখন বাক্য বিনিময় করেন তখন প্রজ্ঞার সঙ্গেই করেন।"[১৯] মানুষ যখন চিন্তন-ক্রিয়ার ধারাবাহিক চর্চা করেন, তখন তা তার পবিত্র অনিন্দ্য অভ্যাসে পরিণত হয় এবং হৃদয় বিনম্র হয়। নিজ পরিবেশে যা কিছুই তাকে প্ররোচিত করে, উত্তেজিত করে: তাতে সে সুন্দর অনুভূতি ও অনুভবের আহ্বানেই আলোড়িত হয়, যে অনুভব-অনুভূতি তার অভ্যন্তরীণ চিন্তা প্রক্রিয়া ও আবেগের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। কোনো এক আবিদ-উপাসককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, "আপনি চিন্তন-ক্রিয়া দীর্ঘায়িত করেন খুব বেশি।" উত্তরে তিনি বলেন যে, "চিন্তন ক্রিয়াই বুদ্ধির মূল।" সুফিয়ান সাওরি র. প্রায়ই একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন, যার অর্থ হল: 'ব্যক্তি যখন চিন্তন-ক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়, তখন প্রতিটি বস্তুতে সে উপদেশ খুঁজে পায়।'[২০]

আর সকল কর্মের সূচনা মানেই হল অনুভূতিগত, জ্ঞানতাত্ত্বিক, চিন্তাগত উদ্যমতা। কারণ যে চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তার পক্ষে ইবাদত-বন্দেগি সহজ হয়ে

---

[18] আবু হামিদ আল-গাজ্জালি, 'আল-হিকমাহ ফি মাখলুকাতিল্লাহ', দার ইহ্‌য়া আল-উলুম, বৈরুত-১৯৮৪, পৃ: ১৩, ১৪।

[19] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'মিফতাহ দার আল-সায়াদাহ', পৃ: ১৮০।

[20] পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮০।

দাঁড়ায়। এ ব্যাপারেই ইমাম গাজ্জালি র. 'ইহয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেন: "হৃদয়ে যখন জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে, তখন তার অবস্থা পাল্টে যায়। যখন হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হয়, তখন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মাদিও পরিবর্তিত হয়। কর্ম তো অবস্থারই অনুসারী। অবস্থা জ্ঞানের এবং জ্ঞান চিন্তার। সুতরাং চিন্তাই হল সকল কল্যাণের উৎস ও চাবিকাঠি। এভাবেই চিন্তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ চিন্তা জিকিরের চেয়েও উত্তম। কারণ চিন্তা-ফিকির যুগপৎ জিকির ও ততোধিক।"[২১]

অভ্যন্তরীণ চিন্তাগত প্রণোদনা যেমন সকল কল্যাণের চাবিকাঠি ও উত্তম কর্ম হিসাবে বিবেচিত, তেমনি তা গুপ্তপাপ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘঠিত প্রকাশ্য সকল পাপেরও মূল। আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে অভিচিন্তক ধ্যানমগ্ন এবং পরকাল সংলগ্ন হৃদয় মস্তিস্ক-বাহিত মন্দ চিন্তা-ধারার বিষয়ে খুব সহজেই সচেতন হতে পারে, ধারাবাহিক চিন্তন ও স্মরণ-ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত সূক্ষ্ম অনুভূতিশক্তির বদৌলতে। তাই মস্তিষ্কে যখনই কোনো অশুভ চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে, তার পরিপক্ক অনুভূতি ও চিন্তাধারা এবং কল্যাণকর ভাবনাগুলো এতে সচেতন হয়ে পড়ে এবং একে ঘিরে ধরে পরিপূর্ণভাবে এর প্রভাব বিনষ্ট করে দেয়। যেমন সুস্থ কোনো শরীর যখন রোগ-জীবাণুর আভাস পায়, শরীরের রোগ-প্রতিরোধ একে ঘিরে রাখে এবং ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর নিয়ামত ও দুনিয়া-আখেরাতের ব্যাপারে রাত-দিন অভিচিন্তনে মগ্ন জ্ঞানীই চিন্তাগত, প্রতিক্রিয়াগত এবং আত্মিকভাবে নিরাপদ। অশুভ চিন্তা যখনই অভ্যন্তরে আবাস গড়ার উদ্যোগ নেয়, তখনই কল্যাণের উল্কাপিণ্ড ছুটে আসে, তাকে ভস্মিভূত করে দেয়, এর প্রভাব বিনষ্ট করে দেয়। যেমন উল্কাপিণ্ড আকাশকে শয়তানের শ্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রহরারত থাকে।

"যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত, তাদের যখন শয়তান-সম্প্রদায়ের কেউ পরামর্শ দেয়, তারা তখনই আল্লাহকে স্মরণ করেন, তারা তখনই সবই দেখতে পারেন।" (আল-আরাফ : ১০২)

পূর্বে বর্ণিত চিন্তন-ক্রিয়ায় মানুষজন জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির যে উপায়গুলো ব্যবহার করে, তার সব থেকেই অভিচিন্তন শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। গভীরতার দিক থেকে চিন্তন-ক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য বিদ্যমান। তেমনি অভিচিন্তনের পরিধি ও বিস্তৃতি ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত, সৃষ্টিজীব থেকে স্রষ্টা পর্যন্ত। এই বিস্তারের উদ্দেশ্য হল নিজে নিজেই উপদেশ গ্রহণ। এ জন্যই দেখা যায় যে, চিন্তন-ক্রিয়া শুধু পার্থিব সমস্যার সমাধানে সীমিত থাকে এবং অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়াকেন্দ্রিক উপায় থেকে অনেক দূরে থাকে। অভিচিন্তন তাই পার্থিব জ্বালা-যন্ত্রণা ও সংকীর্ণতা থেকে পরকালের গভীরতা ও দৈর্ঘ্যে পৌঁছুয়, সীমিত জড়জগত অতিক্রম করে অসীম আত্মিক পর্যায়ে পা রাখে– যা

---

[21] আবু হামিদ আল-গাজালি, 'ইহয়াউ উলুম আল-দিন', দার আল-কলম, বৈরুত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ : ৩৮৯।

মুমিন-বিশ্বাসীর অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভূত জ্ঞানতাত্ত্বিক সকল উদ্যমতা ও প্রাণোদনাকে আলোড়িত করে। তা পূর্ব অভিজ্ঞতার সার-নির্যাস ব্যবহার করে ভাবিত সৃষ্টি জীবকে সকল প্রতীক ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সব উপায়-পদ্ধতি আবিস্কৃত, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে চলে। অতীতে যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনার প্রচলন ছিল, ভবিষ্যত-জীবনে এর যে রূপ দাঁড়াবে সব মিলিয়ে এর সংশিষ্টতার সেতু তৈরি করে। এসব কিছু আল্লাহ কেন্দ্রিক সৎ ভীতি ও উদ্বেলিত অনুভূতির জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) এ জন্যই বলেন যে, "অভিচিন্তন হল জ্ঞানের দুটি সূত্রকে হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা, যেন– তৃতীয় একটি সূত্রের জন্ম হতে পারে।" এর উদাহরণ– "যে ব্যক্তি নগদ প্রাপ্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়, সে যদি জানতে চায় যে, নগদপ্রাপ্তি ও উপস্থিত জীবন থেকে পরকালের জীবনই প্রাধান্য পাবার যোগ্য। প্রথমেই তার জানা উচিত যে চিরস্থায়ীকে প্রাধান্য দেওয়া উত্তম। এরপর সে জানতে পারবে যে, পরকালই চিরস্থায়ী। এ দুটো জ্ঞানসূত্রে সে জানতে পারবে তৃতীয় একটি জ্ঞানসূত্র। আর তা হল পরকালই প্রাধান্য পাবার একমাত্র যোগ্য। পূর্বদুটি জ্ঞানসূত্র ব্যতীত পরকালের প্রাধান্যের সিদ্ধান্ত সহজসিদ্ধ নয়।"[২২] ইমাম গাজ্জালি র. এর বিশ্বাস, এই পদ্ধতির প্রয়োগেই জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কারণ জ্ঞান তার মতে জ্ঞানেরই ফসল। অভিচিন্তক মুমিন-বিশ্বাসী যখন তার অধীত-অর্জিত জ্ঞানকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যাস করতে পারবে, তখনই তার চিন্তাগত সফলতা বেড়ে যাবে, তা চলতে থাকবে অব্যাহতভাবে। যতদিন না তার এপথে জীবনের প্রতিবন্ধকতা বা মৃত্যুর পর্দা এসে পড়ে। গাজ্জালি র. এখানে জড়চিন্তন-ক্রিয়া ও অভিচিন্তনের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করেন এই ভাষায় যে, "অভিচিন্তন প্রক্রিয়ায় যে জ্ঞানসূত্রগুলো অর্জিত হয়, তা থেকে মানুষ কখনো কখনো বঞ্চিত থাকে। কারণ অভিচিন্তনে যে প্রাথমিক সূত্রগুলো সহায়তা করে থাকে, এতে মানুষের দখল নেই। এ জন্যই একজন নিরক্ষর, অশিক্ষিত ব্যক্তি ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের আণুবিক উপাদান বিষয়ে চিন্তন-ক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও এতে কোনো ফললাভ হয় না। তেমনি যে আল্লাহর পরিচয় জানে না, সে এ বিষয়ে অভিচিন্তনে সক্ষম হয় না। এমনকি যদি সে পদার্থ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তবুও না। গাজ্জালি র. এ বিষয়ে যা বলেন তা এই :

"অধিকাংশ মানুষজনই জ্ঞানের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে অক্ষম, তাদের মূল পুঁজি না থাকার দরুন। আর তা হল সেই সকল জ্ঞানসূত্র, যার মাধ্যমে অপর জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে। যেমন- যার কোনো পুঁজি নেই, তার লাভার্জনের কোন ক্ষমতা নেই। কখনো পুঁজি থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়-শিল্পে দক্ষতা না থাকার দরুন, কোনো লাভ হয় না। মানুষের জন্যও পুঁজি-প্রতীম জ্ঞানসূত্র থাকে, কিন্তু তখন সে এর সদ্ব্যবহার বা সংকলনে অথবা ফলপ্রসূ সংমিশ্রণ-পরাগায়ণে দক্ষ নয়।"[২৩]

---

[22] পূর্বোক্ত, পৃ : ৩৮৮।

[23] পূর্বোক্ত, পৃ : ৩৮৮-৩৮৯।

আমাদের ব্যক্তিগত মতামত হল, অভিচিন্তন পরস্পর সম্পৃক্ত তিনটি স্তরকে অতিক্রম করে যায়। এর সমাপ্তি ঘটে চতুর্থ স্তরে, যার জন্য আমরা 'দৃশ্যময়তা' পরিভাষা ব্যবহার করেছি। এর সূচনা ঘটে পঞ্চেন্দ্রিয় তথা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ত্বকের পরোক্ষ পথে। অথবা ধারণা ও কল্পনাকেন্দ্রিক সৃষ্ট অপরোক্ষ উপায়ে, অথবা এ জ্ঞানসূত্র হতে পারে একান্তই বৌদ্ধিক। লক্ষণীয়, অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়ামূলক দিকের সঙ্গে এ সমস্ত জ্ঞানসূত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না প্রায়ই।

মানুষ যখন জগৎ-সংসারে দৃষ্টি সূক্ষ্ম করে তাকায়, অবহিত হতে পারে এর সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্যের কোনো কোনো দিকের প্রতি, এর নিপুণতায়, এর স্বকীয়তা ও শক্তির দিকে; তখনই সরল শীতল জ্ঞানের স্তর থেকে তা সুবিন্যাসের চাকচিক্য, সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও দৃষ্টি মাধুর্য্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এটা জ্ঞানসূত্রের দ্বিতীয় পর্যায়, যা উদ্বেলিত অনুভব, উচ্ছ্বসিত অনুভূতি ও স্বাদগ্রহণের নামান্তর।

এই অনুভব-অনুভূতি থেকে যখন সে অনুপম স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার বিনয় বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তায়ালার পরিচিতি ও তাঁর মহৎ গুণাবলির আলো পেতে থাকে। এভাবেই অভিচিন্তনের তিনটি স্তরের সমাপ্তি ঘটে। সৃষ্ট-জীবের প্রতি দৃষ্টিদান হল অভিচিন্তনের প্রাথমিক পর্যায়– যাতে মুমিন-বিশ্বাসী ও কাফির-অবিশ্বাসী উভয়ই সমান-সমকক্ষ। তেমনি দ্বিতীয় পর্যায় তথা সৃষ্টি নিপুণতা, বিন্যাসের সৌন্দর্য বিষয়ে স্বাদগ্রহণ– যাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ ছাড়াই হৃদয় আলোড়িত হয়, আন্দোলিত হয়। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়, যেখানে জগৎ-সৌন্দর্য ও সৃষ্টি-নিপুণতার স্বাদকে মহান স্রষ্টার সঙ্গের সম্পৃক্তকরণ ঘটে থাকে, তা একটি মহা নিয়ামত– যা একমাত্র মুমিন তথা বিশ্বাসীর ভাগ্যেই ঘটে থাকে।

মুমিন-বিশ্বাসী প্রায়ই ভীত ত্রস্ত থাকে, ব্যতিব্যস্ত থাকে আল্লাহর স্মরণে; এ অনুভূতি-সচেতন অবস্থাতেই পারিপার্শ্বিক সৃষ্ট জগতের প্রতি যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন তার জন্য শুষ্ক শীতল চিন্তন-ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। বরং সর্বত্র সে মহান প্রভুর সৃষ্টি-নিপুণতা ও জগত-সৌন্দর্যের অনুপতার স্পর্শ দেখতে পায়। তখন স্রষ্টা-সমীপে তার বিনম্রভাব ও শ্রদ্ধাভাব ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের এই চিন্তা-প্রক্রিয়া হাসান বসরি র. এর বাণীর তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তোলে, যেখানে তিনি বলেন: "জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই চিন্তন-ক্রিয়ার চর্চা করেন এবং চিন্তন-ক্রিয়ার সাহায্যেই আল্লাহকে স্মরণ করেন। হৃদয়ের সঙ্গে তাদের বাক্য-বিনিময় ঘটে শুধুই প্রজ্ঞাপথে।" যখন শিক্ষা-দীক্ষায় এবং অভ্যাস গড়ার লক্ষ্যে আমরা এবিষয়ে মন নিবদ্ধ করি, তখন বলতে হবে যে, মুমিন-বিশ্বাসী যখন-এ অবস্থায় নিমগ্ন থাকবে, সে চতুর্থ স্তরে উন্নীত হবে, যেখানে অভিচিন্তন একটি প্রোথিত অভ্যাসে পরিণত হবে। অভিচিন্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যখন এই পরিণতি হবে, তখন তার মাধ্যমে পরিবেশে প্রভাবক অভিজ্ঞতা ও বিরল ঘটনা-প্রবাহের সমাবেশ ঘটতেই থাকবে। ক্রমান্বয়ে রাত-

দিনের প্রতিটি পর্বে তার এই অভিচিন্তনের উদ্যমতা বৃদ্ধি পাবে, পরিচিত অভ্যস্ত বস্তুনিচয়ের ব্যাপারে যেখানে সে অনবধান ছিল, তখন সবই আল্লাহর নেয়ামত-মাহাত্ম্য ও করুণাধারা সবই বিনম্রতায়, অভিচিন্তনে ও গভীর চিন্তন-ক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করবে। এক সময় তার পরিবেশে প্রতিটি বস্তুকণাই চিন্তার উদ্বোধক ও অভিচিন্তনের উদ্ভাবক হিসাবে কাজ করবে। তখনই কার্যকরভাবে পৌঁছাবে সে দৃশ্যময়তা-দৃশ্যমানতার পর্যায়ে, যার বিষয়ে অনেক আলেম-ধর্মবিশেষজ্ঞই বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এদের মাঝে ইবনুল কাইয়ুম র. অন্যতম। তিনি এই পর্যায়ের অভিচিন্তকের ব্যাপারে বলেন যে, "তার জন্য আল্লাহর মাহাত্ম্য-দর্শনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর দরবারে তার অনুভূতির দরোজা খুলে যাবে। তখন একক আল্লাহর হাতে জগত-বিবর্তনের সকল কর্ম ও অস্তিত্বের পরিবর্তনের নানা পর্যায় দেখতে পাবে। সে নিজেও তখন লাভ-ক্ষতি, সৃষ্টি-খাদ্য, জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তখন যদি সৃষ্ট-জগতের একটি কণার উপরও দৃষ্টি পড়ে, তা মহান স্রষ্টা, প্রভূ ও তার পূর্ণ গুণাবলি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।"[২৪] আমরা ভূমিকায় উল্লেখ করেছি যে, ইবনে তাইমিয়া এপর্যায়কে বলেন, "নিখুঁত দৃশ্যময়তা"– যেখানে অভিচিন্তক মুমিন-বিশ্বাসী দেখতে পায় যে, "সৃষ্টজগত সবই একমাত্র আল্লাহর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত, তার চাহিদামতো পরিচালিত, বরং তারই জন্য প্রস্তুত, নিবেদনে উদ্বুদ্ধ। বাহ্যিক চোখে যা তারা দেখতে পায় তা অন্তঃস্থ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও মজবুত করে মাত্র।"[২৫] এভাবেই তারা আদিকে অনাদি থেকে এবং স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে পৃথক করে সম্মুখে দাঁড় করান, যাতে শুধু স্রষ্টার এককতাই পরিস্ফুট হয়।

বস্তুত যে মুমিন-বিশ্বাসী সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের স্বাদগ্রহণে, এর মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্মতা-নিপুণতা অনুধাবনে সক্ষম হবে, তার এ পরিপুষ্ট অনুভূতির সমন্বয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি অবশ্যই কর্তব্য। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের জাগতিক নিদর্শনের সম্মুখে নিজের দুর্বলতা, অদক্ষতা ও নীচতার অনুভূতিও জাগ্রত করবে। পূর্ণ প্রশস্ততা সত্ত্বেও বস্তুত এই জগত একটি সামাজিক উপসানালয় মাত্র, যেখানে শুধু মুমিন-বিশ্বাসীরই প্রবেশাধিকার থাকবে– যখন তার আত্মা স্বচ্ছ হবে, হৃদয় বিনম্র হবে, কর্ণ হবে উৎকর্ণ, অর্থাৎ সে হবে একজন প্রত্যক্ষ ব্যক্তি।

মাহাত্ম্য-সৌন্দর্য ও সৃষ্টি-দক্ষতায় অভিভূতি এবং পৃথিবীর দর্শনীয় অবস্থা ও অবস্থানের সামনে মানুষের মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার অনুভব একটি স্বভাবগত বিষয়– যা স্রষ্টা মানব-প্রকৃতিতে গেঁথে দিয়েছেন, যেন সে নভো-ভূমণ্ডলে দৃষ্টি দিয়ে তার দিকেই ফিরেই যায় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রদ্ধায় নিবেদিত হয় অথবা আশা ও

---

[24] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'মাদারিজ আল-সালিকিন', সম্পাদনা : আব্দুল মুনয়িম আল-ইজ্জি, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, আরব আমিরাত।

[25] 'ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া', পূর্বোক্ত, পৃ : ২২১-২২৫।

শঙ্কায় তাঁর উপাসনায় নিয়োজিত হয়। যদি মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে না আসে, বরং সুদৃঢ় সুপথ থেকে বিচ্যুত হয়; যেন সে বহুত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার পথে চলতে পারে, তখনও প্রাকৃতিক এই স্বভাবের ব্যবহার চলতে থাকে, এই ব্যবহার শোভন নয় যদিও, তবুও। আধুনিক এবং প্রাচীন কালের মানব ইতিহাসে পৌত্তলিক ধর্মগুলো যে উপাসনালয়ের আকৃতি, সৌন্দর্য্য, নির্মাণ-নৈপুণ্য এবং আবেগময়ী স্বর, বাণীবাহক ফলক, চমৎকার শিল্পকর্মে সাজানোর উপর গুরুত্ব দিতো, এর রহস্য এখানেই। উদাহরণ স্বরূপ এ্যাথেন্সের উপাসনালয় পার্থেনন (perthenon) এর সৌন্দর্য, দু সহস্রাব্দব্যাপী স্থিত লেবাননের বা'লাবাক শহরে অবস্থিত জুপিটারের (Jupiter) উপাসনালয়ের উচ্চতা, যার বিশাল পাথরগুলো মিসরস্থ আসওয়ান শহর থেকে যোগান দেওয়া হতো।[২৬] তেমনি কারনাক নগরীতে প্রাচীন মিশরীয়গণ কর্তৃক নির্মিত আমোন দেবতার উপসনালয়, যার পরিধি স্কয়ার ফিটে ৫,৮০০ গজ। তার স্তম্ভগুলো বেশ মোটা এবং একেকটার উচ্চতা ৭৮ ফুট।[২৭] এতে প্রবেশকারী এর সু-উচ্চ ছাদে দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবে যে, সে মর্মর, মার্বেল ও গ্র্যানিটের দানব-প্রতিকৃতির সামনে নিতান্ত ক্ষুদ্রাকায়। এসমস্ত উপাসনালয়গুলো যা পৌত্তলিক ধর্ম-কর্তৃক নির্মিত, তা মানুষের ইতিহাসের নিরিখে সবচে বিশালাকায় এবং এর পেছনে মানুষের সীমাহীন শ্রম ও অর্থ-ব্যয় ঘটেছে। কারণ, একটাই। পৌত্তলিক উপাসক যখন এতে প্রবেশ করবে, তার ভেতরে তখন ভীতি অনুভূত হবে, এতে তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে; তখন যাদুকর এবং জ্যোতিষীগণ সংস্কারাচ্ছন্ন যে সমস্ত পৌত্তলিক বাণী ছাড়বে, সবই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবে।

এখানে আমরা সামান্য ভাবতে পারি, আল্লাহর ঘর কা'বা শরিফের সারল্য নিয়ে– অন্ততঃ এই সমস্ত উপানালয়ের তুলানামূলক আলোচনায়। এটা যদিও পৃথিবীর সকল মসজিদের থেকে শ্রেষ্ঠ, তবুও তা শস্যহীন প্রান্তরে, বিস্তৃত আঙিনায় ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ট মাত্র। এমনকি রাসূলের জীবদ্দশায় ইসলামের সেই উজ্জ্বলতর সময়েও।

রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মদিনায় নির্মিত মসজিদের বর্ণনা দিচ্ছেন এ ভাষায় যে, "কতিপয় খুটি, সামান্য বৃক্ষপত্র, যেন একটি চালাঘর, আমার ভাই মুসা (আ.)-এর চালাঘরের মতোই, কর্মটি এর চেয়ে সাধারণভাবে সম্পন্ন হয়।"[২৮] বাস্তবিক পক্ষেই রাসূলের মসজিদ খুব সাধারণভাবেই অর্থাৎ ইট-মাটির সাহায্যে নির্মিত হয়। এর ছাদ ছিল খেজুর শাখা ও বৃক্ষপত্রের, এর উচ্চতাও ছিল সাহাবাদের উচ্চতার নিরিখে সামান্য কয়েক ইঞ্চি উপরে।

---

[26] Encyclopedia Britanicca.

[27] পূর্বোক্ত।

[28] রাজিন বর্ণিত, মুহাম্মদ রিদা সম্পাদিত 'মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ' গ্রন্থে উল্লিখিত, দার ইহ্য়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়া প্রকাশনী, ১৯৪৯, পৃ : ১৭০।

শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাজ্জালি র. মদিনায় রাসূলের মসজিদ নির্মিতির সারল্যের বিবরণ দেন এইভাবে যে, "বেশ সাধারণভাবেই মসজিদের কাজ সম্পন্ন হল, নিচে বালি-কাঁকর, ছাদে বৃক্ষশাখা, খুটিতেও শাখা, বৃষ্টি হলে এর তল কাদাযুক্ত হয়ে পড়ে। হঠাৎ কুকুরের প্রবেশও ঘটে থাকে। আবার তা বেরিয়ে যায়। এই সরল বিনীত ভবনই মানব-ফেরেশতাদের দীক্ষা দিয়েছে, যারা পরবর্তীকালের রাজা-বাদশাহ ও অহংকারী সম্রাটদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। এই মসজিদেই মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালা নবী সা.-কে বিশ্বাসীদের কুরআনের মাধ্যমে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদেরকে সূর্যের আলো প্রস্ফুটিত হওয়া থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত আকাশের শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ করেছেন।"[২৯]

প্রকাশ থাকে যে, যখনই মুসলিম উম্মাহ ও আল্লাহর মাঝে প্রকৃত সম্পর্কে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তখনই মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব-মাহাত্ম্য বেড়ে যায়। অথচ আত্মার সংশোধন ও বিশোধনের প্রেক্ষিতেই এর সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ উচিত। মুহাম্মদ গাজ্জালি আরো বলেন, "মানুষ যখনই উত্তম চরিত্র নির্মাণে অক্ষম হয়ে পড়ে, এর পরিবর্তে তারা সু-উচ্চ মসজিদ নির্মাণে উদ্যোগী হয়। যার মুসল্লি হবে ক্ষীণ-ইমানের। কিন্তু পূর্ববর্তী মহৎ ব্যক্তিগণ মসজিদের অটল নির্মাণ ও সজ্জিতকরণের চেয়ে আত্মার বিশোধন ও সংশোধনে অধিক মনোযোগী ছিলেন।"[৩০]

অনুভব থেকে দৃশ্যময়তার অবতরণে মুমিন-বিশ্বাসী– আমার ধারণা মতে– যে তিনটি স্তর পেরিয়ে যায়, তা এই অধ্যায়ে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। প্রথমেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি, তারপর স্বাদগ্রহণ ও দৃষ্টিমুগ্ধতা, অতঃপর বিনীত অভিচিন্তন। অবশ্য আমি শুধু এই জগতের সৃষ্টিনিপুণ বা চমৎকার বিষয়গুলোকে নিয়েই অভিচিন্তন করার পক্ষপাতী নই। এ পৃথিবীতে সুন্দর-অসুন্দর, মহৎ-অমহৎ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টতে ভরে আছে। কখনো অনুভব জেগে ওঠে দুঃখজনক অথবা ভীতিকর বা বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে। কখনো স্বাদগ্রহণ হয় প্রতিক্রিয়ামূলক নেতিবাচক, কখনো নেতিবাচক অনুভূতি থেকে উপদেশমূলক অভিচিন্তনের উদ্ভব ঘটে থাকে। যা অভিচিন্ত ককে এতে বিরক্ত, অনীহ বা ভীত বা বিরত থাকতে স্মরণ করে দেয়।

অনেক অনেক নিকৃষ্ট প্রভাবশালীকে আল্লাহ তায়ালা কঠিন শক্তিময় হস্তে দমন করেছেন। মুমিন-বিশ্বাসীগণ তার এই পরিণাম বিষয়ে ভাবিত হয়েছেন, এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছেন। যেমন কারুনের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার এবং তার বাড়ির ভূমিধ্বস।

> *"যারা গতকাল তার মতো হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে, তারা বলতে শুরু করেছে, আল্লাহ তার বান্দাদের থেকে যার জন্য ইচ্ছা*

---

[29] মুহাম্মদ আল-গাজালি, 'ফিক্‌হ আল-সিরাহ', দার আল-কুতুব আল-হাদিসাহ, ১৯৬০, পৃ : ১৯০।
[30] পূর্বোক্ত।

তার রিজিকের পথ প্রশস্ত করেন এবং পরিমিত করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তাহলে আমাদের ভূমিধ্বস ঘটত। কাফির-অবিশ্বাসী কখনো সফল হয় না।" (আল-কাসাস : ৮২)

অসংখ্য বিখ্যাত গবেষক, প্রভাষক, বিজ্ঞানী মাদকাসক্ত হয়েছেন। এতে তার লিভার বিকল, মস্তিষ্ক বিনষ্ট হয়েছে। চিন্তাভ্রম, বুদ্ধিভ্রষ্টতা ও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের কেউ আর অবশিষ্ট নেই, শুধু মৃত্যুর মুখোমুখি একটি মানুষ, শ্বাস-প্রশ্বাস-সম্পৃক্ত একটি লাশ মাত্র।

এ সমস্ত দৃশ্য-অনুভব ব্যক্তিকে অভিচিন্তন ও উপদেশ গ্রহণে আহবান করে। কখনো হয় তা ভ্রমণ পদ্ধতিতে যা নির্মাণ-সৌন্দর্য ও দক্ষতার শান্ত অনুধাবনে পথে আগত অভিচিন্তনকে অতিক্রম করে যায়।

এই উপলক্ষে পাঠকের সামনে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করব, যা দুঃখজনক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বাড়ির পার্শ্বেই একটি মসজিদে একজন যুবকের মৃত্যু ঘটে। যার দরোজা অনিবার্য কারণে বন্ধ ছিল। তার মৃত্যু ঘটেছিল বৃহস্পতিবারে। তাই শনিবারের পূর্বে তার মৃত্যু-সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় নি। লাশের দাফন-কাফনের জন্য সবার সঙ্গে আমিও উপস্থিত হই। যখন লাশ উঠানো হয়, তখন যেখানে লাশ পড়ে ছিল, সেই আদ্র ভূমিতে সমবেত কীট-পতঙ্গ দেখতে পাই। সেই সময়ে যেই অনুভূতি আমাকে গ্রাস করেছিল মৃত্যু সম্পর্কে, জীবনের তুচ্ছতা-সম্পর্কে আমার যে পাঠ-গবেষণা সে তুলনায় একবারেই নগণ্য।

চিন্তন-ক্রিয়া ও অভিচিন্তন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এখানেই ক্ষান্ত করতে চাই। কারণ পরবর্তী "অভিচিন্তনের স্তরায়ণে ব্যক্তিক পার্থক্যসমূহ" অধ্যায়ে এ বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

অভিচিন্তন ও স্বজ্ঞালব্ধ / অলৌকিক ধ্যান

ইউরোপ-আমেরিকায় স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যানের ব্যাপক ছড়াছড়ি, এ জাতিদ্বয়ের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। এটা অবশ্য একারণে যে, এই ধ্যান-পদ্ধতি প্রাচীন প্রাচ্য ও হিন্দুত্ববাদী মৌলিকতাসহ জ্ঞানগত, প্রতিক্রিয়াগত সমস্যাসম্পৃক্ত রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে ব্যাপক ক্ষমতা রাখে। এ ছাড়া মাদকাশক্তি, অস্থিরতাসহ স্নায়ুবিক নানাবিধ ব্যাধির নিরাময়েও তা বেশ কার্যকর।

তাই এখানে আমরা এর জন্য একটি অধ্যায় নির্ধারণ করেছি, যেন শারীরিক অস্থিরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও প্রতিক্রিয়াকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ফুটে ওঠে এবং ইসলামি ইবাদতের মতো এর চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ধ্যানের প্রভাব, অভিচিন্তনের সঙ্গে এর প্রত্যেকটির ঘনিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

ইসলামি শরিয়া এবং ফরজ ইবাদতগুলো সম্পর্কে যে-ই অভিচিন্তনে অভিনিবেশ করবে, সে-ই সহজে জানতে পারবে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধের বাস্তবায়নে প্রতিটি মুসলিমের অপার কল্যাণ নিহিত আছে, পরকালের পূর্বে এই ইহকালেই। আর এতো এখন স্পষ্ট যে, আধুনিক গবেষণা সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত উন্নতি করে চলেছে, শরিয়ার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রায়োগিক দিকগুলোয় উপকারিতা ও কল্যাণ তত প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়ের কতিপয় দিক তো এখন স্পষ্ট। কারণ, সমকামিতা, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্যগ্রহণ ও মদ্যপানের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞার প্রজ্ঞা-প্রকাশে বিজ্ঞান এখন ক্লান্ত। মাদকদ্রব্য এবং মদ তো আজকের দিনে মৌলিক ত্রাস হিসাবে স্বীকৃত, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধুনিক কালের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নিতান্ত অসহায়।

আমেরিকা এখন খোলাখুলি ঘোষণা করছে যে, এলকোহলই হল তাদের প্রধান সমস্যা। মার্কিন সমাজ মাদকাসক্তি নিরাময়ের পেছনে প্রতি বৎসর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে চলেছে। মাদকতায় মত্তদের কারণে যে অঘটনগুলো ঘটছে, তার পেছনেও তাদের ব্যয়ের পরিমাণ ততোধিক। এছাড়া মাদকাসক্তির ফলে মিলিয়ন মার্কিনি কর্মাক্ষম হয়ে পড়ায় সমাজ তাদের অর্থকরী কর্ম-চাঞ্চল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই মাদকাসক্তি ইউরোপ-আমেরিকায় হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পর তৃতীয় সমস্যা হিসাবে পরিগণিত।

তেমনি আমরা ইউরোপ-আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে অহরহ ধর্ষণ ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকার গুরুত্বের কথা শুনছি। বিশেষ করে এইড্‌সসহ অপরাপর যৌনবাহিত রোগের ছড়াছড়ির কারণে।

ইসলামি শরিয়া যে সমস্ত ফরজ, সুন্নাহ ও মুস্তাহাব প্রবর্তন করেছে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পাই যে, এর যথাযথ বাস্তবায়নে মুমিন-বিশ্বাসীর মানসিক-শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে। মুমিন-বিশ্বাসী পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের পূর্বে যেভাবে মেসওয়াক ব্যবহারসহ ওজু সম্পন্ন করে, অপবিত্রতার পর গোসল করে, এছাড়া আরো অনেক রীতি-নীতি পালন করে থাকে; এর বাহ্যিকতা যদিও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, কিন্তু এর মূল ও গূঢ় কথা হল শারীরিক সুস্থতা। এগুলোই আমাদেরকে ইসলাম নির্দেশিত সুন্নাহ-চর্চায়, ইবাদতসমূহে মুসলিম-অনুসৃত পদ্ধতির নিহিত উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করে। খাদ্যে স্বাভাবিকতা এবং ক্ষতিকর অপব্যয় থেকে বিরত থাকা, (*"তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।"* আল-আরাফ : ৩) রোজার সুস্থতা কেন্দ্রিক উপকারিতা, নামাজে শারীরিক অনুশীলন ইত্যাদি সবই অসংখ্য কল্যাণের সংবাদ বহন করে।

মুমিন-বিশ্বাসীর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার নিরিখে যে অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতা ইবাদত হিসাবে স্বীকৃত তার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা এখানে প্রশ্ন তুলতে পারি। তখন এর জবাব মিলবে হাজার হাজার গ্রন্থে, গবেষণায়– যা সাম্প্রতিক কালে সম্পন্ন হয়েছে। অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, রক্তের উচ্চচাপ, রক্তচাপ, মাথাব্যাথা, অনিদ্রা, রক্তে কোলেসটেরলের পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি মানসিক চাপজনিত অস্থিরতার নিরাময়ে বিশ্বাসকেন্দ্রিক ও আত্মিক কর্ম-প্রক্রিয়া এবং স্বজ্ঞালব্দ/ অলৌকিক ধ্যানের গুরুত্ব যেখানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

মানসিক চাপজনিত সাইকোসোমেটিক-রোগের চিকিৎসায় আধুনিক গবেষণা বলে যে, মানুষের চিন্তন-ক্রিয়া ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রণোদনা-তৎপরতা মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির সৃষ্টিতে, সংক্রমণে বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তেমনি যেই চিন্তন-ক্রিয়া ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রণোদনা এ অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির জনক, তার পরিবর্তনে ব্যক্তির নিরাময় বা সুস্থতাকেন্দ্রিক পরিবর্তন অর্জিত হয় অনেক ক্ষেত্রে। এটাই হল বিখ্যাত সেই প্রবাদের ব্যাখ্যা : "অসুস্থতার ভাণ করো না, তাতে সত্যি সত্যি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। মারা পড়বে শিগ্গির।"

শারীরিক অবস্থার উপরে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি যা নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। যখনই সে কোনো বেদনাদায়ক, ভীতিকর বা দুঃখজনক সংবাদ শুনতে পায় অথবা পূর্বাভিজ্ঞা-সদৃশ কোনো কাহিনী শোনার সময়ে সে অস্থির হয়ে পড়ে, তার হৃদ-কম্পন অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে যায়। তেমনি সে যদি ফর্সা রঙের হয়ে থাকে, তাহলে লজ্জায় সে লাল হয়ে ওঠে। অবশ্য এ-ও মান্য যে, শারীরিক পরিবর্তনের এই সামান্য ক্রিয়া মানুষের শরীরতত্ত্বের (physiology) গঠনে জ্ঞানতাত্ত্বিক তৎপরতার যে বিশেষ ভূমিকা থাকে, সে বিষয়ে অনেককেই তুষ্ট করতে পারে না।

কিন্তু গূঢ় শরীরতত্ত্বে যে প্রকাশ ঘটে, যা মূলত চিন্তা-ভাবনার গভীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরিলক্ষিত হয়; তা প্রমাণ হিসাবে যেমন নাটকীয়, তেমনি সন্তোষজনক। এর উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় অমূলক অন্তঃসত্তার প্রকাশ, যা ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারীর বিশ্বাস 'যে সে অন্তঃসত্তা'– সে অনুসারে ঘটে থাকে। এসময়ে তার নিয়মিত ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। পেটের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অন্তঃসত্তার মতোই। স্তনদ্বয়ের আকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দুগ্ধবর্ধক লালাগ্রন্থি ফুলে ওঠে। বরং কোনো কোনো নারী যেমনটা চিকিৎসক Benson[৩১] বলেন যে, অন্তঃসত্তার ধারণা অনুসারে চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে তারা গর্ভাশয়ে নবজাতকের আলোড়ন অনুভব করে থাকে। কিন্তু যখনই সেই নারীর কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে, তা মানসিক অন্তঃসত্তা, তখনই খুব দ্রুত শারীরিক পরিবর্তনের নিদর্শনগুলো স্তিমিত হতে থাকে।

এর গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি উদাহরণ এই যে, অনেক রোগীর শারীরিক সুস্থতা গুটিকয় বড়ি/ বটিকা বা ক্যাপসুল সেবন করার পরপরই বাড়তে থাকে। যদিও এটা নিশ্চিত যে ঐ বড়ি/ বটিকা বা ক্যাপসুলে সক্রিয় কোনো পদার্থই নেই। কিন্তু রোগীর একান্ত বিশ্বাস যে, এতে রোগ-নিরাময়ের উপযুক্ত ঔষধ বিদ্যমান। কখনো কখনো ক্যাপসুলে সামান্য ক্রিয়াত্মক ধাতু বিদ্যমান থাকে, কিন্তু চিকিৎসক খুব জোর দিয়ে বলেন যে, তা অত্যন্ত উপকারী। কোনো কোনো সময় চিকিৎসক লবণ ও জল-মিশ্রিত তরল পদার্থকে নির্দিষ্ট ঔষধ হিসাবে রোগীর শরীরে ইনকেজশন পুশ করেন, এতেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাঠ-গবেষণা বারবার এটা প্রমাণ করেছে যে, এই সমস্ত ব্যাধিগ্রস্থদের শারীরিক উন্নতি এভাবেই বাড়তে থাকে যে, কখনো কখনো মনে হয়, তারা যেন মৌলিক ঔষধই ব্যবহার করেছেন।[৩২]

বিজ্ঞানীগণ এই সাম্প্রতিক কালে এই বিষটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত যখন এটা স্পষ্ট হল যে, মানসিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রণোদনা-প্রতিক্রিয়া শারীরিক অসুস্থতাকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় ও ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

অসংখ্য গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কারণে এটা আজ স্পষ্ট যে, আত্মবিশ্বাসহীনতা, ভীতিবোধ, মারাত্মক একাকিত্ববোধ, অস্থিরতা, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে যে পুরনো মানসিক চাপ, তা জীবাণুবাহিত রোগ-ব্যাধি এমন কি ক্যান্সারের প্রতিরোধে মানুষের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। পুরনো সেই মানসিক চাপ বৃক্কতন্ত্রীগুলোকে এমনভাবে প্রস্তুত রাখে যে তা হরমোন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা প্রাকৃতিক প্রতিরোধের প্রণোদনা-নিরোধক কর্টিসান (cortisone) পদার্থ উৎপন্ন করে থাকে। এই সমস্ত গবেষণার প্রভাবেই নতুন একটি বিষয়ের জন্ম লাভ হয়েছে যা

---

[31] H. Benson, 'Beyond the Relaxation Response', Bertkley Books, N.Y., 1985.

[32] পূর্বোক্ত।

(Psychonero-immunology) 'মনোস্নায়ু প্রতিরোধ বিজ্ঞান' নামে পরিচিত। এই জ্ঞানশাখা দুটি ভিন্ন প্রান্তরের বিশেষজ্ঞদের এমনভাবে মিলিত করে, পারস্পরিক ঘনিষ্ট সহায়তার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা অতীতে কখনো হয় নি। আর এ প্রান্তর দুটি হল সামাজিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ যন্ত্রের রসায়ন গবেষণার প্রান্তর। শত শত গ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছে, যা মানুষের শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে চিন্তা-অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে। আধুনিক পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রথমত শল্য চিকিৎসার উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত পেনিসিলিন ও জৈবিক প্রতিরোধক আবিস্কারের পর অনেক বিজ্ঞানীই মনোবিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে 'তৃতীয় বিপ্লব'[৩৩] হিসাবে অভিহিত করতে তৎপর। কারণ মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রণোদনাকে যা গঠন করে তা-ই কিন্তু মূল-নিয়ামক ও উদ্দীপক নয়– কোনো মাধ্যম ব্যাতিরেকে সরাসরি তার প্রতিবেশেই সৃষ্ট হয়। বরং যা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে, তা হল ঘটনা ও উদ্দীপনার মূল্যায়ন ও কল্পনাশক্তি। খ্রিস্টিয় প্রথম অব্দের একজন রোমান দার্শনিকের একটি উক্তি আছে। যাতে তিনি বলেন : 'পরিবেশ-প্রতিবেশ মানুষকে কখনোই অস্থির করে না। বরং প্রতিবেশ-বিষয়ক ভাবনাই তাকে অস্থির করে তোলে।'[৩৪]

সুতরাং প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 'সুস্থ শরীরে সুস্থ বুদ্ধির অবস্থান' হলেই হবে না। বরং প্রয়োজন হল, 'সুস্থ বুদ্ধি ও সুস্থ শরীরের সহাবস্থান।'

চিন্তন-ক্রিয়া ও তার আনুষঙ্গিক অবকাশ শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার চিকিৎসায় কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

ডাক্তার চিকিৎসক রোগীকে যে সব পথ্য ও নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তা বাহ্যত সাধারণ বিষয়। কিন্তু এর ফল অত্যন্ত দ্রুত কার্যকর হয়। যেমন তা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট পরিচিত এবং হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত। আধুনিক শত শত গবেষণা-অভিজ্ঞতা– যা রোগ নিরাময়ে তনু-মন পরিবর্তনের ধারণাকে উন্নত পদ্ধতিতে করতে সহায়ক চিকিৎসাকেন্দ্রিক নিরীক্ষার জন্য পরিচালিত– তা প্রমাণ করে যে, এই স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যানমগ্নতা যা কেন্দ্রীভূত ধ্যানমগ্নতার একটি বিশেষ পদ্ধতি, যা প্রকৃতপক্ষে একটি চিকিৎসা বিপ্লব; যেখানে মানুষ নিজেকে নিজে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে তার আত্মিক-মানসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক শক্তিকে ব্যবহার করে থাকে।

আমেরিকায় সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থ থেকে সে সব সাধারণ পথ্য ও নির্দেশগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরছি, যার রচয়িতা চিকিৎসক Benson[৩৫]। যিনি ধ্যানমগ্নতা ও

---

[33] 'Newsweek', Nov.7, 1988.

[34] H. Benson, পূর্বোক্ত।

[৩৫] পূর্বোক্ত।

অবকাশসহ প্রাচ্য ধর্মগুলো ও যোগচর্চার প্রাচীন পদ্ধতিগুলো থেকে ব্যাপক সাহায্য নেওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

Benson রোগীকে নির্দেশ করেন, যেন সে একটি শান্ত নিরাপদ স্থানে শরীরকে ব্যাপকভাবে শিথিল করে আরামদায়কভাবে আসন গ্রহণ করে। তারপর দুটি চোখ বন্ধ করবে। অত্যন্ত সুস্থির, ধীর ও গভীরভাবে শ্বাস নিতে থাকবে। তার সকল চিন্তা শ্বাস-প্রশ্বাসে কেন্দ্রীভূত করবে। তিনি আরো নির্দেশ করেন, যেন রোগী যে কোনো একটি শব্দ বা ধর্মীয় বা বিশ্বাসসম্পৃক্ত একটি ছোট বাক্য বেছে নেয়। ফুসফুস থেকে যখনই বায়ু বের করবে, তখনই এর অর্থে মনোযোগ নিবদ্ধ করে ধারাবাহিকভাবে বারবার তা আওড়াতে থাকবে। তার পূর্ব নির্বাচিত শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তে রোগী যদি নিজে কোনো অর্থ বা পরিকল্পিত বাক্যবন্ধ্যকে নির্বাচন করে, তখনও সে পূর্বোল্লিখিত রীতিতে ধারাবাহিকভাবে একই ভাবনায়-কল্পনায় উচ্চারণ করবে।

আমেরিকানরা যখন চিকিৎসা-ক্ষেত্রে স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যানমগ্নতার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে থাকেন, তখন প্রথাগত প্রাচীন হিন্দুরীতি থেকে তা পরিপূর্ণভাবে নকল করেন। এক সময় তাদের নির্দেশ ছিল নিছক অর্থহীন বা হিন্দি অর্থযুক্ত অথবা প্রাচীন প্রাচ্য কোনো শব্দ উচ্চারণ করার– যা চিন্তক বা ধ্যানমগ্ন লোকের অপরিচিত, অজানা। পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন যে, অর্থযুক্ত বা ধর্মীয় বিশ্বাসযুক্ত কোনো বাক্যবন্ধের উচ্চারণ চিন্তক ব্যক্তির মনে অথবা কোনো বিশ্বাসবোধের আবরণে, মানসিক ভাবনায় রোগ-নিরাময়ে ও চিন্তার গভীরতায় ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।

স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যান-মগ্নতার বাহ্যিকতার গবেষকগণ দেখতে পান যে, নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত বা বিশ্বাসযুক্ত কোনো শব্দের ধারাবাহিক আবৃত্তি-উচ্চারণের সময় মস্তিষ্ককে কেন্দ্রীভূত করলে তা চিন্তক ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। যা আরো গভীরতর ভাবনা ধ্যানস্থল বা চিন্তাস্থল থেকে নতুনতর কোনো পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। একইভাবে সে আরো উচ্চতর ভাবনার অর্থে উপনীত হতে পারে, যাতে স্বাভাবিক জীবন, হন্তারক ঘনিষ্টতা, রুটিন মাফিক সীমিত ইন্দ্রীয়ানুভূতির কারণে উপনীত হওয়া যায় না। এ জন্যই একে স্বজ্ঞালব্ধ-অলৌকিক ধ্যানমগ্নতা বলা হয়।

চিন্তক তথা ধ্যানীর জন্য প্রয়োজনীয় নিদের্শনাগুলোর অন্যতম হল, বিভিন্ন রকমের চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়-বাহিত কল্পনাকে ত্যাগ করতে হবে, যা তাকে চিন্ত্য বিষয়ে মস্তিষ্ককে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। চিন্তা-ভাবনার বিষয় হিসাবে দ্বিতীয়বার তিনি যা নির্বাচন করবেন, তাকে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করার জন্য অনুশীলন চালিয়ে যাবেন। ধ্যানের আসন হবে শিথিল নেতিবাচক পদ্ধতির, যেন দীর্ঘদিন অনুশীলনে প্রশিক্ষিত হতে পারে। তখনই তার চিন্তা-ভাবনা গভীর হবে, শরীর হবে ঢিলেঢালা, শিথিল। অসুস্থ চিন্তা-ধারা ও পারিপার্শ্বিক হৃদয়-বাহিত ভাবনার

পদচারণা হ্রাস পেতে পারে। তখন অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও বেদনা-আক্রান্ত শারীরিক সমস্যাগুলো বিলোপ হতে পারে। অনেক গবেষকই বিশেষত Benson এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, কোনো ব্যক্তি যদি দৈনিক দুবার সকাল সন্ধ্যায়–এই ধ্যান-প্রক্রিয়া পালন করে– প্রতিটি ধ্যানের সময় হবে পনের-বিশ মিনিটের– তখন শারীরিক পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে সে অনেক স্বস্তিবোধ করবে। শুভ-প্রত্যাশী হবে, সৃষ্টিশীল ভাবনা ও সৃজনক্রিয়ায় অধিক শক্তিসম্পন্ন হবে।

এই উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ অনুভব করা যায় সূক্ষ্ম শারীরবৃত্তের উপর ধারণা করে। যেমন- রক্তচাপ কমে আসা, এতে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমে আসা। যা চিকিৎসককে ঔষধ সেবনের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বা একবারের জন্য বন্ধ রাখতে উৎসাহিত করে যে সমস্ত পুরনো রোগীদের ক্ষেত্রে যারা স্বজ্ঞালব্দ/ অলৌকিক ধ্যানমগ্নতা-চিন্তন-ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন থেকে রাসায়নিক চিকিৎসা-গ্রহণে অভ্যস্ত। ড. বেনসন[৩৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, যে সমস্ত রোগী ধ্যানমগ্নতা-চিন্তন-ক্রিয়ায় অভ্যস্ত নয়, তাদের সঙ্গে সামগ্রিক তুলনায় যারা বিশ্বাসনিষ্ঠ ধ্যানমগ্নতা ও অবকাশ-গ্রহণে অভ্যস্ত; তাদের রক্তে কোলেস্টরলের পরিমাণ প্রায় ৩৭% কমে আসে। গবেষকগণ এটাই লক্ষ্য করেছেন যে, হৃদস্পন্দনের গতি অনেক কমে আসে, প্রতি সেকেন্ডে যার পরিমাণ দাঁড়ায় তিনটি স্পন্দন। এছাড়া শরীরের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের বিন্যাস ও শর্করা প্রজ্বলনের পরিমাণও কমে আসে। মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র যে কল্পনাকে ধারণ করে, তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত স্পন্দন ও কম্পনের সঙ্গে গভীর ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির শান্তি-প্রশান্তি বিশেষভাবে জড়িত।

শরীর-বৃত্তের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুপাত হল দুর্বল বৈদ্যুতিক প্রবাহের মোকাবেলায় মানবিক ত্বকের অধিক শক্তি-সঞ্চয়। কারণ দুর্বল বৈদ্যুতিক গতি প্রবাহে ত্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতা– যে বিষয়ে পরীক্ষিতব্যের কোনো অনুভূতি কাজ করে না– মানসিক প্রশান্তির অন্যতম পরিমাপক হিসাবে গণ্য। তাই দেখা যায়, মানুষের হাতের চেটোয় আর্দ্রতা ও ঘর্মাক্ততা বৃদ্ধির অনুসারে গতি-প্রবাহ প্রতিরোধের ক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। তবে আর্দ্রতা ও ঘর্মাক্ততা কমে আসলে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এতো জানা কথা যে, ঘর্মাক্ততার বর্ধন দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা প্রধান মাপকাঠি। হাতের আর্দ্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি খুব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নিরীক্ষিতব্যের হাতে দুটি দণ্ড স্থাপিত করে, তখন গতি-প্রবাহ বিশেষ একটি যন্ত্রে পরিণত হয়।

L. Le. Shah[৩৭] প্রায় কুড়িবারের মত মুদ্রিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ How to Meditate-এ বর্ণনা করেন যে, স্বজ্ঞালব্দ, অলৌকিক চিন্তন-প্রক্রিয়া, ধ্যানমগ্নতা গতি-প্রবাহের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, কখনো কখনো তা ৪০০% পর্যন্ত পৌছুয়।

---

[৩৬] পূর্বোক্ত।

[37] L. Le Shan, `How to Meditate', Bantam Books, London, 1988.

Le. Shan তাগিদ দিয়ে বলেন যে, গভীর চিন্তন-ক্রিয়া ও ধ্যান-মগ্নতা মানসিক প্রশান্তি র একটি বিশেষ স্তর, যা পূর্ণত অস্থিরতা ও ক্রোধের বিপরীত।

এ হলো আধুনিক চিকিৎসা-যন্ত্র ও সূক্ষ্ম মানসিক পরিস্থিতিকর্তৃক নির্ণিত পরিস্থিতি। কিন্তু ব্যক্তিক অনুভূতি– যাকে অসুস্থ ধ্যানমগ্নরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে– তা আরো নাটকীয়। তাই মাথা ব্যথার তীব্রতা, পুরনো ঔদরিক পীড়া, বুক-ব্যাথা ইত্যাদির মতো মনো-শারীর সমস্যাগুলো কমে আসে, তেমনি লোপ পায় অনিদ্রা, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা। রোগী ব্যাপকভাবে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। যদি শারীরিক সমস্যাগুলো পুরোপুরি লোপ নাও হয়, তবুও তার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তখন রোগী এ পদ্ধতির ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ও সচেতন হয়ে পড়ে।

অভ্যস্ত ও অসুস্থ চিন্তক-ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিগণ যে সমস্ত মনো-পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেন, তা হল স্বস্তিবোধ, ব্যক্তিক-জ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান, জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে ব্যক্তির উষ্ণ-সম্পৃক্তির গভীরাণুভূতি, মানুষের উদ্দীপক অনুভব, সৃষ্টিক্ষমতা ও সৃজনশীলতার প্রবর্ধক শক্তি ও ব্যাপক প্রশান্তিবোধ।

ধ্যানমগ্ন অনেক ব্যক্তিই এই অনুভূতিকে প্রবাসীজনের আত্মীয় পরিজনের সাক্ষাতের অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করে থাকে।

Le Shan গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, স্পৃষ্ট জড়-জগতের পেছনকার গূঢ় অনুভূতি কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, ব্যক্তিক কোনো ইঙ্গিতও নয়; বরং এ এক বাস্তবতা– যা বিশ্বের নানা প্রান্তের সাধক জ্যোতিষীদের নির্ণিত আত্মিক অভিজ্ঞতার মাঝেকার পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। Le Shan এর বর্ণনায় তারা জ্ঞানের এমন স্তরসমূহে উপনীত হন, যা দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ বা ব্যক্ত করতে তারা অক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বৃহৎ সাদৃশ্যময়তা ব্যক্তিকে তাদের সত্যায়নে উদ্বুদ্ধ করে। স্বজ্ঞালব্ধ নব জ্ঞান ও অভ্যস্ত জড়জগতে ব্যক্তির পরিচিত জ্ঞানের মাঝে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় উভয় জ্ঞানের বাস্ত বিক অস্তিত্ব-সত্ত্বে, Le Shan একে ব্যাখ্যা করেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার সর্বশেষ তত্ত্বের সংশ্লেষে। আর তা হল, যে কোনো বাহ্যিক প্রকাশকে দুটি বিপরীত রূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কোনো কোনো বস্তুবিষয়ের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেও। খব ঝযধহ এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে জগতের বাহ্যিক বিষয়ের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা ব্যর্থ হলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান জড়-বাস্ত বতার প্রকৃতি-বিষয়ক ধারণাকে পাল্টাতে বাধ্য হয়। এরপর ঘটে আইনস্টাইনের আগমন, যিনি সাধারণ ও বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সকল ধারণাকে পাল্টে দেন। কাল হয়ে পড়ে চতুর্মাত্রিক, পিণ্ড হয়ে পড়ে শক্তির কেন্দ্রীভূত রূপ। এভাবেই

পরিমাপক পাল্টে যায়, জগত-বিষয়ক চিন্তা-চেতনাও পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। এই রকম ঘটনা যদি জ্ঞানের ক্ষেত্রে জড়স্তরেও ঘটে, গবেষক অবাক হবেন না। যেমনটি Le Shan বলে থাকেন যে, সেখানে জগত-জীবন-সম্পর্কিত জ্ঞানের উচ্চতর একটি পর্যায় হতে পারে, যা মানুষ শুধু অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে।

বর্তমান অধ্যায়ে এই কটিমাত্র পৃষ্ঠায় শারীরিক সুস্থতার চিন্তা-ধ্যান, প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করলাম। মনো-শারীরিক নানা রোগের বেলায় মানুষ কীভাবে সুস্থতার সন্ধান পাবে? অথবা জ্ঞানগত দিক যদি পথচ্যুত হয় এবং জীবাণুর আক্রমণের শিকার হয়, সত্যি সত্যি রোগাক্রান্ত হয়; তখন কীভাবে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তেমনি এই সমস্ত অসুস্থাবস্থার নিরাময়ে চিন্ত-নক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, ধ্যান ও অনুভূতিকেন্দ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিকতার কীরূপ হতে পারে– তা স্পষ্ট করেছি। প্রতীচ্যে পরিচিত স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি, কারণ তা মনোস্তাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত, যার উপকারিতা চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বীকৃত এবং চিন্তন ক্রিয়া-ধ্যান মগ্নতার সঙ্গে যার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

ধ্যান ও চিন্তন-ক্রিয়ার এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে আস্থাবান অভ্যস্ত মুমিন-বিশ্বাসী এর বাহ্যিক রীতিপদ্ধতি এবং নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ধ্যান, এর আনুষঙ্গিকতা হিসাবে আল্লাহর জিকির-স্মরণ ও তাসবিহের পারস্পরিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে পারবে খুব সহজেই। উভয় পদ্ধতিই মস্তিস্ককে ভাবনার বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অস্বস্থির হ্রাস বা নিস্কৃতি করার ক্ষেত্রে সমানভাবে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ তা মস্তিষ্ককে বাহিরের শোরগোল এবং মনের অভ্যন্ত রের আকস্মাৎ উৎপন্ন চিন্তা, কল্পনা থেকে বিরত রাখে। বার বার উচ্চারণ ও আবৃত্তির মাধ্যমে ভাবিত অর্থের পুনরাবর্তন ও পুনর্বিবেচনার এ দুই পদ্ধতি একই ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তাসবিহ পাঠকারী, চিন্তন-ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তেই অভাবিতপূর্ব ভাবনা, অভিনব অনুভূতি ও নতুন অর্থের মুখোমুখি হয়। তাই দেখা যায়, অভ্যাসের শৃঙ্খল, সমাজের দাসত্ব ও জড়জীবনের দৈনন্দিন কারাগার থেকে জড় ইন্দ্রীয়ানূভূতিকে মুক্ত করার জন্য উভয় পদ্ধতিই গভীর চিন্তন-ক্রিয়াকে ব্যবহার করে। তখনই সে বিস্তৃত দিগন্তের সন্ধান লাভ করতে পারে, জ্ঞানের প্রসস্ততা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

ইউরোপ আমেরিকার বাজারে স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া এবং ইমান-বিশ্বাসের সহযোগে অবকাশ-যাপন বিষয়ের বই পত্র ও ক্যাসেটের যে সয়লাব, একজন মুসলিম পাঠক তা পাঠ করে স্বাভাবিকভাবেই চিকিৎসকদের নানা উপদেশ-উপাত্ত সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সে যখন এইগুলো পাঠ করে, অবচেতনভাবেই তার মনে নামাজের পর উবু হয়ে বসা মুমিন-বিশ্বাসীর সজীব চিত্রটাই ফুটে উঠবে। তখন সেই মুমিন-বিশ্বাসী আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব-বড়ত্ব, সৃষ্টি-সূক্ষ্মতা এবং অসীম

নেয়ামতের পাথারে নিমগ্ন, বারবার পাঠ আবৃত্তি করে চলেছে সে তাসবিহ, তাহমিদ ও তাকবির। অবাক ব্যাপার হল, আমরা যে সাদৃশ্যপূর্ণতার কথা আলোচনা করে চলেছি, সে বিষয়ে ড. Benson (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে) নিজ থেকেই কতিপয় ইসলামি বাক্য, শব্দ নির্বাচন করেছেন, যা অবকাশ, স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া/ ধ্যানমগ্নতায় আগ্রহী মুমিন-বিশ্বাসীর আবৃতি ও পাঠযোগ্য। তিনি বলেন, একজন মুসলিম পাঠ ও আবৃতির/ উচ্চরণের জন্য আল্লাহ আল্লাহ শব্দটি অথবা আহাদ আহাদ শব্দটি নির্বাচন করতে পারেন। কারণ বেলাল রা. যখন মুসলিম হওয়ার অভিযোগে নিজ মুনিব-কর্তৃক কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছিলেন, তখন তিনি এই শব্দটিই উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য Benson আহাদ শব্দটিকে ইংলিশে (Ahadum) আহাদুম বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

যদি স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া/ ধ্যানমগ্নতা ও এর মূলনীতির ব্যাপারে কেউ প্রাচীন প্রাচ্য ধর্মগুলোকে অনুসন্ধান করে, এর বাহ্যিকতা এবং মুসলিমের ধ্যান-প্রক্রিয়ার বাহ্যিক সাদৃশ্যতা খুঁজে ফেরে, তাহলে আবুল আ'লা মওদুদী[৩৯]-র উক্তিকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হবেন। তিনি বলেন যে, বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্ম সুদূর অতীতে বিশুদ্ধ বোধ-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন যার সকল নিদর্শনই অবলুপ্ত। এখন অবশিষ্ট আছে শুধু বিকৃত বিশ্বাস, কিছু আনুষ্ঠানিকতা এবং আঁকড়ে ধরে আছে ধ্যানমগ্নতা ইত্যাদির মতো বাহ্যিকভাবে উপকারী রীতি-প্রথা। মূল উদ্দেশ্য তথা সকল ভাবনাকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করা, তার তাসবিহ-পবিত্রতা পাঠ করা, তার সৃষ্টি জগতে ভাবিত হওয়া– এগুলো বর্জন করে আছে। এখন পশ্চিমা বিশ্ব সেই সব পরিত্যক্ত অভ্যাসে ও রীতিগুলোকে চিকিৎসাকেন্দ্রিক উপকারিতার নিরিখে সজাগ করে তুলছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের সকল ইবাদত, রীতি-প্রথার প্রতিষ্ঠা, নির্দেশিত ও নিষেধকৃত কাজকর্মের পেছনে মানুষের কল্যাণ নিহিত, যা পাবে মৃত্যুর পূর্বে এই পৃথিবীতেই। যাদের জানার তারাই তা জানতে পায়, যাদের জানার আগ্রহ নেই, তারা তা জানতে পায় না।

এতো আজ অবিদিত নয় যে, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ব্যতিরেকেই আত্মিক কোনো বিষয়ে বা নির্ধারিত কোনো মূলবোধে সক্রিয় চিন্তায় নিবদ্ধকরণ এবং মস্তিষ্ককে কেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে প্রশান্ত অবকাশযুক্ত অবস্থায়ও পূর্ণ নিমগ্নতায় সুনির্দিষ্ট শব্দ ও অর্থের বারবার উচ্চারণ মানুষকে দৈনন্দিন ব্যস্ততা ও হৃদয়-বাহিত সাময়িক কল্পনা থেকে নিষ্কৃতি দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির পেছনের পর্যবেক্ষণে এবং জড়-জগতের পেছনের সঙ্গতির স্থায়িত্বে পৌঁছিয়ে দেয়। মানসিক ও শারীরিক উভয়দিকেই এর উপকারিতা অনস্বীকার্য।

---

[38] Benson, পূর্বোক্ত, পৃ : ১০৯।

[39] আবুল আলা আল-মাওদুদি, 'মাবাদি আল-ইসলাম', দার আল-কুরআন আল-কারিম, দামেশক, ১৯৭৭।

মানুষ নিজ প্রতিবেশে প্রাকৃতিক উদ্দীপকের উপর মস্তিষ্ককে কেন্দ্রীভূত করেও এই উপকারিতা লাভ করতে পারে। যেমন- চড়ুইর কিচির-মিচির, বায়ু দোলায়িত সুশান্ত বৃক্ষ-বীথির মর্মর-ধ্বনি, এমনকি হৃদস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো বিষয়েও সুবিন্যস্ত অভ্যন্তরীণ শরীরের সাঙ্গীতিকতা কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া বা যে কোনো রকমের ধ্যান-মগ্নতার অভ্যস্ত তায় একজন অমুসলিমই এতো সমস্ত উপকারিতা লাভ করতে পারে। আর তা যেমন একজন মুসলিম যদি মেসওয়াক ব্যবহার, গোসল, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, নখ-কর্তন, হালকা শরীর চর্চার উপর অভ্যস্ত হয়; সেই সঙ্গে মদ্যপান, মাদকাসক্তি ব্যভিচার ও খাদ্য-অপচয় থেকে বিরত থাকে– তার মতো। জগৎ-জীবনে এর সব কিছুই উপকারী, যা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত রীতি-বিধানে প্রবর্তিত এবং রাসূলের জীবনযাপনে অনুসৃত। অথবা তা কখনো কখনো হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত স্বভাবজ বিষয়, পরিবেশ-প্রতিবেশের পার্থক্য ও জাতিগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মানুষ যার জন্য স্বস্তিবোধ করে। যেমন নদীর স্রোত, সুশোভন সজীবতা ও মুখ-সৌন্দর্য্যে মানুষ অভিভূত হয়, স্বস্তিবোধ করে।

একজন স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া/ ধ্যানমগ্নতায় অভ্যস্ত ব্যক্তি যা লাভ করে, একজন অভিচিন্তক ধ্যানমগ্ন মুমিন-বিশ্বাসী সুস্থতাসম্পৃক্ত সকল উপকারিতাই– তা শারীরিক হোক বা মানসিক– লাভ করতে পারবে, কখনো তার চেয়ে বেশিও লাভ করতে পারবে। শুধু বিশ্বাসের বিশুদ্ধতায় সারল্যে, দূর-দৃষ্টি ও ধর্মীয় বোধের স্বচ্ছতার গুণে এবং জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদায়কৃত সকল তাসবিহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গভীর অনুধ্যান ও অভিচিন্তকের মাধ্যমে।

বরং কখনো কখনো সে আরো স্বল্প সময়ে কম চেষ্টায় তা লাভ করতে পারে। আহমদ আল-কাজি[৪০] আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যে "সর্বোচ্চ নিরাময়" নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক সূক্ষ্ম কর্মপরিচালনা করেন, তার শেষে তিনি বলেন যে, একজন মুসলিম যদি শুধু কুরআনের আয়াতগুলো নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে– সে শ্রোতা আরবিভাষী হোক বা না হোক– এতে তার শারীরিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এতে তার অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা হ্রাস পাবে, প্রশান্তি ফিরে পাবে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবর্তনসহ পূর্বে বর্ণিত সকল উপকারিতা লাভ করতে পারবে। যেন তা স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক অভিচিন্তন / ধ্যানমগ্নতারই ফল। ড. আহমদ আল-কাজি তার পরীক্ষায় রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, মাংসপেশীর বন্ধনশক্তি ও বিদ্যুৎপ্রবাহে ত্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রায় ৯৭% অবস্থায় কুরআন শরিফ সুস্পষ্ট প্রশান্তিবর্ধক হিসাবে কাজ করে থাকে।

---

[40] আহমাদ আল-কাদি, 'তাসির আল-কুরআন আলা ওজাইফ আল-জিসম আল-বাশারি ওয়া কিয়াসুহু বিওয়াসিতাহ আজহিজাহ আল-মুরাকিবাহ আল-ইলিকতুরুনিয়া', ইয়াদাত আকবর, পানামা সিটি, ফ্লরিডা, ১৯৮৪।

ধ্যান-মগ্নতা ও অভিচিন্তনের মৌলিক উপকারিতাগুলো অর্জিত হয় আল্লাহর উপাসনার সঙ্গে সম্পৃক্তি ও আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে। ইসলামি ইবাদত-উপাসনা হিসাবে অভিচিন্তন-ধ্যানমগ্নতা ও শারীরিক মানসিক চিকিৎসা হিসাবে স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া/ ধ্যানমগ্নতার বাহ্যিক সাদৃশ্যতার কথা আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা শুধু বহিরাবরণগত। এর মূল শাঁস হল সৃষ্টিজীবের অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতা থেকে স্রষ্টার কাছে উপনীত হওয়া, সকল রকমের আকিদা-বিশ্বাসের দূষণ বা বহুত্ববাদের ন্যূনতম সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে একত্ববাদে পৌঁছানো। ইসলামি ধ্যানমগ্নতা-চিন্তন ও জীবন-জগৎ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা ও নিখুঁত আকিদা-বিশ্বাস ছাড়া স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক অভিচিন্তন/ ধ্যানমগ্নতার উদাহরণ হল দুটি ঝিনুকের মতো, যাদের বাহ্যিক আকৃতি সাদৃশ্যপূর্ণ। ডুবুরি কর্তৃক সাগরের গভীর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া দুটি ঝিনুকের একটির পেটে-অভ্যন্তরে রয়েছে সেই বিরল মুক্তা। অপরটির পেটে-অভ্যন্তরে ছোট্ট সাগর-প্রাণীর অবশিষ্টাংশ যা কোনো উপকারেই আসে না।

একজন অমুসলিমের সৌভাগ্য, মানসিক স্বস্তি, মস্তিষ্ক-স্বচ্ছতার অস্পষ্ট অনুভূতি এবং জগৎ সংসারের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে তার সুগভীর সম্পর্কের অবোধগম্য অনুভব– যা তাকে সত্যি সত্যি দীর্ঘ প্রবাসের পর আপনজনের কাছে যেন পৌঁছে দেয়– তা মৌলিক ও বাস্তব অনুভূতি। অভিচিন্তন ও ধ্যান-মগ্নতার প্রভাবে এবং অনুধ্যেয় অজড় মূল্যবোধ-প্রাপ্তির মাধ্যমে উদ্ভূত নীরব প্রভাব, যা পরিশোধিত, পরিসীমিত। কখনো তা জীবনে একবারই ঘটে থাকে। তখন দৈনন্দিন অন্ধকার জীবনের তুলনায় তা তার কাছে বিরাট পরিবর্তন বলে বোধ হয়। একজন অসুমলিমের এই অনুভূতি, তার অভ্যন্তরে এর প্রভাব সত্ত্বেও বাস্তবে তা স্ফীতকায় সাগরের একটি বিন্দুমাত্র, যেই সাগরের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয় একজন মুমিন-বিশ্বাসী অভিচিন্তক, যে কি-না আল্লাহর তাসবিহ ও তাহলিলে ব্যস্ত। অবশ্য তার এটা নিশ্চিতভাবে জানা যে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি কণাই আল্লাহর নামে তাসবিহ পাঠ করছে। *"প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসায় মুখর, কিন্তু তোমরা তাদের ভাষা বুঝতে পারো না।"* (আল-ইসরা : ৪৪)

অভিচিন্তক মুমিন-বিশ্বাসী যদিও জগত-সংসারের তাসবিহের ভাষা বুঝতে অক্ষম, তবু সে সন্দেহাতীতভাবে তা অনুভব করতে পারে। তার তাসবিহের সুরে সুর মিলিয়ে সকল সৃষ্ট জীবের কণ্ঠধ্বনি সে গভীরভাবে অনুভব করে। চিন্তা ও ধ্যানের ধারাবাহিকতায় এই অনুভূতি আরো গভীরে পৌঁছুয়। শেষ পর্যন্ত সে সু-উচ্চ আত্মিক চূড়ায় অবস্থান নেয়, আত্মিক আনন্দ ও স্বাদের এমন এক পর্যায়ে পা রাখে, যার সঙ্গে পার্থিব জগতের কোনো কিছুরই তুলনা চলে না। যারা স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক চিন্তন-ক্রিয়া/ ধ্যানমগ্নতার চর্চা করে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সেই আত্মিক অনুশীলন করে, এমন কি যারা এই সমস্ত চিন্তন-ক্রিয়া ও ধ্যানমগ্নতার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে; তাদের কল্পনায়ও তা আসে না।

ইবনুল কাইয়ুম (র.) এই নিয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যেখানে পার্থিব সকল দুশ্চিন্তা, অসুস্থতা, সমস্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমনটি আলোর প্রকাশে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। তিনি বলেন, "আল্লাহর স্মরণে মগ্ন অভিচিন্তক / ধ্যানমগ্ন মুমিন-বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য নীরবতা ও একাকিত্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন সকল স্থান-কালের ধ্বনি-কম্পন থেমে আসে। কারণ তখন তার ইচ্ছাশক্তি ও আত্মার সম্পর্ক একীভূত হয়ে যায়। তার ইচ্ছা ও আত্মাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে, এমন ধরনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর তার সম্মুখে ইবাদত-উপাসনার স্বাদের দ্বার এমনভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে যে, তখন কোনোভাবেই তার তৃপ্তি আসে না। খেলাধুলায়, প্রবৃত্তি-পূরণে যে স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করত, তার দ্বিগুণ তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে ইবাদত-উপসনার মগ্নতায়। এই অবস্থা যখন তার উপর চেপে বসে, প্রাধান্য পায়; তখন পার্থিব দুশ্চিন্তা ও পারস্পরিক বিষয়াদির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। তখন তার অস্তিত্ব ও অন্য সকল মানব অস্তিত্বের মাঝে বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।"[৪১]

যেমন শাইখ ইবেন তাইমিয়া র. ও জিকির-ফিকির ও অভিচিন্তনের বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাঁদের একজন বলেন, "আমি এমন একটি অবস্থায় উপনীত যে, বলতে থাকি: "জান্নাতবাসীগণ যদি এই অবস্থায় উপনীত হন, তাহলে তা নিশ্চিত সুখী জীবন।" অন্য একজন বলেন, "আত্মার জন্য এমন কিছু মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, যার আনন্দে সে নেচে ওঠে।" অন্য একজন বলেন– ধেলাধুলায় মত্ত ব্যক্তিদের তুলনায় রাত ব্যাপী আল্লাহর জিকির-ইবাদত মগ্ন মানুষদের সময় অনেক তৃপ্তিদায়ক।"[৪২]

স্তূপীকৃত জড়তার অন্ধকারে যাদের জীবন-আটকে আছে, কখনো কখনো চিন্তা-ধ্যানের কারণে, দূর নিরীক্ষণের সুবাধে তাদের সামনে দুর্বোধ্য নীরব আলোর হঠাৎ ঝলকানি ফুটে ওঠে। *"যখনই তাদের সামনে আলো জ্বলে ওঠে, তারা চলতে শুরু করে। যখন অন্ধকার হয়ে আসে, থেমে পড়ে।"* (আল-বাকারা: ২০) তাদের দুর্ভাগ্যের জীবন ও আল্লাহ-প্রদত্ত আলোর সাহায্যে যারা পথ চলেন- তাদের জীবনের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব!

---

[41] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'মাদারিজ আল-সালিকিন', পৃ : ৩১-৩২।

[42] 'ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া', পূর্বোক্ত, পৃ : ৬৪৭।

অভিচিন্তনের উৎসাহ-প্রদানে কুরআনের কতিপয় রীতি

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টজগত বিষয়ে অভিচিন্তন-ধ্যানমগ্নতা ইসলাম-নির্দেশিত ইবাদত-উপাসনাগুলোর মাঝে সর্বোচ্চ। সুতরাং এটা কোনো অবাক ব্যাপার নয় যে, সমগ্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে ভাবতে-অভিচিন্তনে উদ্বুদ্ধ করবে নানা রীতি পদ্ধতিতে– যা রুচি ও আত্মিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই। এতে যার হৃদয়ে সামান্যতম প্রাণের স্পর্শ থাকবে, সেও এ পথে ধাবিত হতে উৎসাহিত হবে। এভাবেই মানুষ অনুভূতির স্থূলতা, অভ্যাসের স্থিরতা, প্রখার একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসবে। যেন তারা স্বচ্ছ হৃদয়ে, সজীব দৃষ্টিতে আকাশ ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারে।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে আল্লাহর নেয়ামত-অনুগ্রহের স্মরণ ও আলোচনার মাধ্যমে। তখন আল্লাহর করুণাঘন দয়ার আবেশে আনত পরিবেশের মাধ্যমে অভিচিন্তন-ধ্যানমগ্নতা ও উপদেশ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

> *"আল্লাহ তায়ালা আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। এতে মৃত্যুর পর ভূমি সজীব হয়ে ওঠে। এতে শ্রবণ-আগ্রহী জাতির জন্য বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান। গবাদিপশুর মাঝে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তাদের মল ও রক্তের মাঝামাঝি থেকে আমি তোমাদের বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের তৃপ্তি প্রদান করে।"* (আন-নাহল : ৬৫-৬৬)

কখনো কখনো সম্বোধনে ধমক ও ভীতি-প্রদর্শনের জোর থাকে। এ সমস্ত আয়াতগুলো কঠিন হৃদয়ের কাফের-অবিশ্বাসীদের প্রতি তাক করা– যাদের জন্য এই কঠোর পদ্ধতিই প্রযোজ্য। এই সমস্ত আয়াতগুলো সাধারণত *"তারা কি দেখে না..., তারা কি প্রত্যক্ষ করে না ..."* ইত্যাদি নেতিবাচক প্রশ্নের মাধ্যমেই সূচিত।

> *" তারা কি তাদের সম্মুখে-পশ্চাতে, আকাশ-ভূমণ্ডলে দেখতে পায় না? যদি আমি চাই তাদের নিয়েই ভূমিধ্বস ঘটাবো অথবা আকাশ-খণ্ডের পতন ঘটাবো। এতে অনুগত প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন বিদ্যমান।"* (সাবা : ৭)

> *"তারা কি উট দেখতে পায় না, তা কীভাবে সৃষ্ট? আকাশ দেখতে পায় না, তা কীভাবে উত্তোলিত? পাহাড় দেখতে পায়না, তা কীভাবে প্রোথিত? ভূমি দেখতে পায় না, তা কীভাবে বিস্তৃত?"* (আল-গাশিয়া : ১৭-২০)

> *"যারা কাফের-অবিশ্বাসী তারা কি দেখতে পায় না যে, আকাশ ও ভূমণ্ডল ছিল সংযুক্ত। আমি তাকে বিদীর্ণ করেছি। পানি থেকে আমি সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছি। তারা কি তা বিশ্বাস করে না।"* (আল-আম্বিয়া : ৩০)

তেমনি এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কুরআনের অনেক আয়াত কখনো কাহিনীর আবরণে বর্ণিত, কখনো নবীদের জবানিতে প্রকাশিত। যেমন নূহ (আ.)-এর জবানিতে কাফের-অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা:

> *"তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা রাখো না। আল্লাহ তোমাদেরকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালা আকাশকে পরতে পরতে সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে চন্দ্রকে তিনি জ্যোতি হিসাবে এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।"* (নূহ : ১৩-১৬)

তুলনায় তৃতীয় রকমের আয়াত দেখতে পাই, যেগুলোতে অভিচিন্তন / ধ্যানমগ্নতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতে বুদ্ধিমানদের প্রতি করুণাঘন সংবাদবচন বিদ্যমান, যারা অস্তি-জগতের প্রতিটি বিষয়ে উপদেশ খুঁজে পান। আল্লাহ তায়ালা ও তার অসংখ্য নেয়ামত অনুগ্রহের স্মারক খুঁজে পান। এই সমস্ত ব্যক্তিগণ মানসিক ও শারীরিক সার্বিক অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে থাকেন:

> *"নভো-ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান, যারা পার্শ্বে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করে থাকেন: নভো-ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে ভাবনায় মথিত হন। হে প্রভু, এগুলো তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করো নি। তুমি পবিত্র, আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো।"* (আল ইমরান: ১৯০-১৯১)

তেমনি মানুষের সৌন্দর্য-প্রকৃতিকে উস্কে দিয়ে জগৎ-সংসারের নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে অভিচিন্তত ও ধ্যানমগ্ন হওয়ার জন্যও কুরআন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূরা ফাতিরের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এমন এক পদ্ধতিতে যা গাছপালা, জীব-জন্তু, জড় পদার্থসহ যা কিছু পৃথিবীতে বিদ্যমান, তা রঙ-বেরঙের সৌন্দর্যানুভূতিকে উস্কে দেয়:

> *"তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বণ্টন করেছেন। এরপর আমি এর মাধ্যমে নানা রঙের ফল উৎপন্ন করেছি। পাহাড়ের অনেকগুলোই নবীন সাদা, লাল, নানা রঙের এবং নিকষ কালো। মানুষ এবং চতুষ্পদ জীবজন্তু নানা রঙের। জ্ঞানী আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশীল ও দয়াময়।"* (ফাতির : ২৭-২৮)

তেমনি দেখতে পাই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে, লাভবান হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন:

> *"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যই জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, এতে তোমাদের জন্য রয়েছে উষ্ণতা ও উপকারিতা। এথেকেই তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করে থাকো। তোমাদের রাত-দিনের চলাফেরায় এতে সৌন্দর্য বিদ্যমান।"* (নাহল : ৫-৬)

আরো বলেন:

> *"যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছেন। মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সূচনা করেছেন কাদা থেকে।"* (সাজদা : ৭)

শহিদ সাইয়েদ কুতুব তাফসিরগ্রন্থ 'ফি জিলালিল কুরআন'-এ *"যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে সৌন্দর্য দান করেছেন"* – এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন :

"এ অস্তিত্ব অপরূপ। এর সৌন্দর্য অনিঃশেষ। মানুষ এই সৌন্দর্যানুভূতিতে অগ্রসর হয়। অস্তিত্বের উদগাতার ইচ্ছানুসারে, আপন সাধ্যের সীমানায় সীমাহীন এই সৌন্দর্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সৌন্দর্যগুণ এই অস্তিত্বে একটি ঐচ্ছিক বিষয়। নির্মাণের দৃঢ়তা সকল বিষয়েই পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত, সৌন্দর্যের চূড়া পর্যন্ত উন্নীত। সৃষ্টির পূর্ণতা প্রতিটি অঙ্গে সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত এবং প্রতিটি সৃষ্টিতে। এই মধুপোকা, এই পুষ্প, এই তারকা, এই রাত, এই উষা, এই ছায়া, এই মেঘ– এ সকল সাঙ্গীতিকতা অস্তিত্বের পরতে পরতে বিস্তৃত। বক্রতাহীন নিখুঁত ও সুষম।

অনুপম সৃষ্টি সৌন্দর্যের অস্তিত্বে একক উপভোগ্য ভ্রমণ। কুরআন আমাদেরকে এর প্রতি আহ্বান করে, যেন তা গ্রহণ করতে পারি, এর দিকে ঝুঁকে পড়তে পারি। তিনি বলেন, *"যিনি সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে সৌন্দর্য প্রদান করেছেন।"*

> হৃদয় তখন সচেতন হয় মহান অস্তিত্বের নন্দন ও সৌন্দর্যের বাঁকগুলোকে খুঁজে নিতে।"[৪৩]

অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশের সর্বোচ্চস্তর হল স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি জগতের কতিপয় বিষয়ের নামে শপথগ্রহণ। চিন্তার গভীরতা ও সৃষ্টিজগতে ধ্যানমগ্নতার ক্ষেত্রে এ হল সর্বোচ্চ আহবান। আল্লাহ তায়ালা মধ্যাহ্ন ও দিবাসূচনার শপথ নিয়েছেন, শপথ নিয়েছেন সন্ধ্যা-লালিমা ও চাঁদের, শপথ নিয়েছেন তিন ও জয়তুনের। শপথ নিয়েছেন ভোরের উদয় ও রাতের আগমনের।

অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতাকে ইবাদত-উপাসনা হিসাবে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার কারণেই অতীতে বড় বড় জ্ঞানী ও আল্লাহ-ভক্ত লোকের সন্ধান মেলে। এ প্রসঙ্গে তাই হাসান আল-বাসরি র. বলেন, "মুহূর্তের অভিচিন্তনে-ধ্যানমগ্নতায় সুদীর্ঘ রাত বিনিদ্রভাবে ইবাদতে কাটানোর চেয়ে উত্তম।"[৪৪] খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ জোর দিয়ে বলেন, "আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করে কথোপকথন করা উত্তম। আল্লাহর নেয়ামত অনুসারে মুহূর্তের অভিচিন্তন-ধ্যানমগ্নতা উত্তম ইবাদত।"[৪৫]

---

[43] সাইয়দ কুতুব, 'ফি জিলাল আল-কুরআন', পঞ্চম খণ্ড, দার আল-শুরুক, পঞ্চম প্রকাশ, পৃ : ২৮০৯।

[44] আল-হাফিজ ইবনু কাসির, 'তাফসির আল-কুরআন আল-আজিম', প্রথম খণ্ড, দার আল-মারিফাহ, বৈরুত, ১৯৬৯, পৃ : ৪৩৮।

[45] পূর্বোক্ত।

ইসলাম নিজ বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে

আত্ম পরিচয়হীনতা, আপন সত্তার বিষয়ে অভিচিন্তনে-ধ্যানমগ্নতায় ও পাঠ-গ্রহণে অবহেলা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নিরতিশয় অকর্মণ্যতা ও জগৎ-সংসারে আল্লাহর সর্ববৃহৎ নিদর্শনের ব্যাপারে বিস্মরণের সমান্তরাল। ইসলাম যেহেতু আকাশ-বাতাস, সাগর-পাহাড়, নদ-নদীর ব্যাপারে অভিচিন্তনে, উপকারী ও জীবনের সহায়ক মানব-উদ্ভাবিত আবিস্কারের ব্যাপারে ধ্যানমগ্নতার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে, তখন খোদ মানব-সৃষ্টির বিষয়ে– যে মানবকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছেন, নভো-ভূমণ্ডলের সকল কিছুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন– মানুষকে ভাবার জন্য ধ্যানমগ্নতায় উৎসাহিত করবে এটাইতো স্বাভাবিক।

"আকাশে এবং ভূমিতে যা কিছু বর্তমান, সবই তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। এতে ভাবুক অভিচিন্তক/ ধ্যানোৎসাহী জাতির জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।" (জাসিয়া : ১৩)

কুরআনের অভ্যন্তরে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের বিষয়ে অভিচিন্তনের গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রকাশে অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান। কারণ মানুষ একে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি-নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করে। তা সত্ত্বেও মানুষের বিষয়টি কুরআনে বিশেষভাবে অনেক আয়াতে বর্ণিত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন অনুভূতির স্থিরতা ও প্রথাগত একঘেয়েমি থেকে হৃদয়কে জাগ্রত করার জন্য হরেক রকমের উপায়-পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে। যেন নভো-ভূমণ্ডলের প্রভুর নির্দশনগুলোকে জাগ্রত চিত্তে ও দীপ্ত দৃষ্টিতে দর্শন করতে পারে। তেমনি কুরআনের আয়াতগুলো মানুষের বিষয়ে এমন সব পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে, যা মনকে আকর্ষণ করতে পারে, হৃদয়কে করতে পারে উদ্বেলিত।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির বিবরণ, তার করুণা ও অনুগ্রহের সঙ্গে এর সম্পৃক্তি তৈরি করে "সূরা মুমিনুল"-এর আয়াতগুলোতে অসম্ভব বিস্তৃতি নিয়ে বলেন:

"মানুষকে আমি কাদামাটি থেকে তৈরি করেছি। স্থির অবস্থানে তাকে বীর্য হিসাবে রেখেছি। বীর্যকে করেছি রক্তপিণ্ড। রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ড। মাংসপিণ্ডকে হাড় হিসাবে পরিণত করি। হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করি। এরপর তাকে ভিন্ন একটি সৃষ্টিতে পরিণত করি। প্রশংসা সেই উত্তম সৃষ্টিকর্তার।" (আল-মুমিনুল : ১২-১৪)

অন্য এক জায়গায় বলেন:

"বলো হে নবী, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের শ্রবণযন্ত্র, দর্শনযন্ত্র ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।" (আল-মূলক : ২৩)

তবে যারা পাথর-হৃদয়, অহঙ্কারী; তাদের কুরআন নেতিবাচক-নঞর্থক প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন। কিছু উদাহরণ পূর্বে পেশ করা হয়েছে। যেমনঃ

"মানুষ কি দেখতে পায় না যে, আমি তাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। অথচ সে সুস্পষ্ট তার্কিক।" (ইয়াসিন : ৭৭)

"আমরা কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করি নি? এরপর তা নিরাপদ আশ্রয়ে রাখি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আমিই নির্ধারণ করি, আমিই উত্তম নির্ধারক। মিথ্যুকদের জন্য ধ্বংস।" (আল-মুরসালাত : ২০-২৪)

আবার মানব-প্রকৃতিকে সৌন্দর্যবোধে জাগিয়ে তোলার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন :

"আমরা মানুষকে সুষম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।" (আল-তিন : ৪)

আরো বলেনঃ

"আকাশ এবং ভূমিকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের অবয়ন দান করেছেন। তোমাদের অবয়বকে সুন্দর করেছেন। তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (আল-তাগাবুন : ৩)

আল্লাহ তায়ালা নিজ জগৎ-নির্দশন ও পৃথিবীর সৃষ্টজগতের অনেক বিষয়েই শপথ নিয়েছেন। যেমনঃ মধ্যাহ্ন, রাত, সূর্য, তিন, জয়তুন ইত্যাদি। একে আমরা এ বিষয়ে ভাবনা, অভিচিন্তনের অন্যতম আহ্বান হিসাবে বিবেচনা করি। তেমনি আল্লাহ খোদ মানুষজনের নাম নিয়েই শপথ গ্রহণ করেছেন। কখনো জগৎ-নিদর্শনের আবরণে, কখনো কিয়ামত দিবসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এভাবেই মানুষের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সূরা আল-কিয়ামাহ-এর সূচনায় মানবাত্মার সৃষ্টিকর্তা ও বিচার দিনের মালিকের পক্ষ থেকে এমনই শপথের প্রকাশ ঘটে।

"কিয়ামত দিবসের নামে আমি শপথ করি না, আমি শপথ করি না তিরস্কারকারী মানব-প্রাণের। মানুষ কি তাই ভাবে যে, আমরা তাদের হাড়গুলোকে সংস্থিত করতে পারব না? হ্যা, আমিই বরং প্রতিটি আঙুলকে সোজা করতে পুরোপুরি সক্ষম।" (আল-কিয়ামাহ : ১-৪)

সূরা আল-শামস-এ আল্লাহর শপথের প্রকাশ ঘটছে মানবাত্মার সামঞ্জস্য বিধানের নামে এবং জগতের মাঝে দ্রুত অকস্মাৎ ভ্রমণ শেষে তাকে নির্দেশনার নামে। আল্লাহ এখানে চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, আকাশ-নির্মাণ ও ভূমির বিস্তৃতির নামে শপথ করেছেন।

"শপথ মানবাত্মার, তিনি যাকে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তাকে পাপ ও পূণ্যের নির্দেশনা দিয়েছেন। যে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে, সে সফল। যে আত্মাকে ভ্রষ্ট করেছে, সে বিফল।" (আল-শামস : ৭-১০)

তেমনি আল্লাহ অন্যান্য দিক নিয়েও শপথ করেছেন, যা মানবকে বিশেষায়িত করে। তাই ছোট্ট অথচ পূর্ণ ও ব্যাপক একটি সূরায় তিনি কালিক-মুহূর্ত নিয়ে শপথ করেন, যে কালিক-মুহূর্তে মানুষ পৃথিবীতেই অতিবাহিত করে।[৪৬] এর সংক্ষিপ্তি সত্ত্বেও তার সমাপ্তি মানুষকে সবার উর্ধ্বে নিয়ে যায় অথবা পতন ঘটায় অন্তহীন গর্তে :

"শপথ অপরাহ্নের, সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু যারা ইমানদার, সৎকর্মপরায়ণ, সত্যের নির্দেশদাতা এবং ধৈর্য্যের নির্দেশদাতা- তারা ছাড়া।" (আল-আসর : ১-৩)

যেমন আপন সত্তার নামে তিনি কুরআনের সত্যতার বিষয়ে শপথ নিয়েছেন এবং এখানে মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। আর তা হল, তার বাক-শক্তি ও প্রকাশ-ক্ষমতা:

"আকাশ এবং ভূমির প্রভুর শপথ! এ কুরআন তো সত্য। যেমনিভাবে তোমরা কথা-বার্তা বলে থাক।" (আল-জারিয়াত : ২৩)

এ হল কুরআনের মুষ্টিমেয় কিছু উদাহরণ, যা মানুষকে আত্ম-বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। বাস্তবে এ অস্তি-জগতে একমাত্র মানুষই যদি আল্লাহ তায়ালার অলৌকিকতা ও তার সৃষ্টির কমনীয়তা-সৌন্দর্য-প্রকাশ হিসাবে অভিহিত হয়, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের জন্য তা-ই যথেষ্ট। এতেই সে আল্লাহর দরবারে অবনত হবে। তাহলে মানবের প্রকৃতি কী? তার আত্মা ও বুদ্ধি কী? সবই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। মানবিক বুদ্ধি একে আয়ত্ত করতে এবং সম্যক উপলব্দি করতে অক্ষম। এগুলো যদিও মানব-উপাদান– যার সমন্বয়ে সে মানব হিসাবে পরিণত– কিন্তু তা জড়বস্তু নয়। স্থান-কালের গণ্ডির ভিতরেও একে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আর মানুষের বুদ্ধি শুধু স্থান-কালস্থ বিষয়কেই আত্মস্থ করতে অভ্যস্ত। অন্য কিছুকে নয়। মৌলিকভাবে এটা এক মহা চ্যালেঞ্জ। যা মানুষের কাছে বিনয় ও স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে এইভাবে যে, সে আপন উপাদানের অনুভবেও আয়ত্ত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে।

আচরণিক মনস্তত্ত্বের বিষয়াদিও অনেক সহজ। এর নিদর্শনগুলো গবেষণা-নিরীক্ষা তথা শিক্ষা, আলোচনা, প্রতিক্রিয়া, ঝোঁকের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। যদি পঠিতব্য মনোবিজ্ঞান সীমাহীন সাগরের পাড় বেয়েও চলে। তা যেন একটি শিশুর মহাসাগরের তীরে খেলার মতো।

কিন্তু স্পৃষ্ট শরীরতত্ত্বের জড়দিকগুলো খুব জটিল। মানুষ যদি তার পূর্ণ জীবন ব্যয় করে ভাবতে থাকে, অভিনিবেশসহকারে মানব-শরীরের নিদর্শনগুলোর পাঠ নিতে থাকে, তখনও খুব সামান্য পরিচয় ও জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হবে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আধুনিক যুগের মানব-কর্তৃক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির পরও জগৎবিষয়ে মানব-মস্তিষ্ক অনেক ধাঁধাঁয় নিপতিত হয়। এর প্রতিই কুরআনের আয়াতের ইঙ্গিত:

---

[৪৬] পূর্বোক্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ : ৫৪৭।

"তোমরা কি নিজেদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দাও না?" (আল-জারিয়াত : ২১)

অবতীর্ণের সময় থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তা নিত্য চ্যালেঞ্জ হিসাবেই থাকবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শহিদ সাইয়েদ কুতুব যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, পাঠকের জন্য তা উপকারী হতে পারে বিবেচনায় সরাসরি তুলে ধরছি :

"তোমরা কি নিজেদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দাও না?" এই পৃথিবীতে মানুষই হল সবচে বড় আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু সে নিজের মূল্যায়নে অবহেলা করে। আপন সত্তায় লুক্কায়িত রহস্যের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। যখনই তার ইমানের বিষয়ে উদাসীন হয়, বিশ্বাসের নিয়ামত-অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়।

শারীরিক নির্মাণে রহস্যের সংগুপ্তিতে এই শরীর একটি বিস্ময়। আত্মিক গঠনে আত্মার রহস্যের সংগুপ্তিতে অন্য একটি বিস্ময় বিদ্যমান। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণভাবেও সে বিস্ময়ের ব্যাপার। কারণ সেই তো জগৎ-সংসারের উপাদানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। কবির ভাষায়:

"তোমার ধারণা, তুমি সামান্য অণু মাত্র। অথচ তোমাতেই লুকিয়ে আছে মহা-জগৎ।"

মানুষ যখনই আত্ম-ভাবনায় নিমগ্ন হবে, অসংখ্য রহস্যের সম্মুখে দিশেহারা হবে, বিস্ময়ভিভূত হবে। তার আঙ্গিক নির্মাণ ও বিন্যাস, প্রত্যেক অঙ্গের দায়িত্ব আদায়ের পদ্ধতি, তার আত্মার রহস্য, বিদিত-অবিদিত শক্তি অনুভবযোগ্য বিষয়ে অনুভবক্ষমতা, অনুভব পদ্ধতি, এর সংরক্ষণ ও স্মরণ, এসব ধারণকৃত চিত্র কোথায় এবং কীভাবে? এই চিত্র এবং দৃশ্য ও ধারণা কীভাবে ছাপ রেখে যায়? কীভাবে এবং কোথায় এর আহ্বান-আবেদনের-প্রকাশ, যার জন্য এগুলো চলে আসে। এ হল সেই শক্তির বিদিত রূপ। অবিদিত সে তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

এরপর প্রজনন ও উত্তরাধিকারের সৃষ্টিতে এ প্রজাতির রহস্য বিদ্যমান। একটি মাত্র দেহকোষ সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব প্রজাতির সকল পুঁজিকে ধারণ করে। তেমনিভাবে পিতা-মাতা ও নিকট পিতামহদের বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে। তাহলে ক্ষুদ্র দেহকোষে এতোসব বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত থাকে কীভাবে? কীভাবেই তা নিজে নিজে দীর্ঘ ইতিহাসের পথের সন্ধান পায়? সাদৃশ্য ও প্রতিনিধিত্ব দাঁড়ানোর সে এক কৌশল বটে। যার শেষ পর্যায় হল বিস্ময়কর মানব অস্তিত্বের প্রত্যাবর্তন।"[৪৭]

---

[47] সাইয়দ কুতুব, পূর্বোক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ : ৩২৭৯-৩২৮০।

অভিচিন্তন মুক্ত স্বাধীন ইবাদত-উপাসনা

আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ও এতে সংঘটিত নানা ঘটনা নিয়ে ভাবনা, ধ্যানমগ্নতা এমন একটি বিষয়, স্থান-কালের বিবর্তনে যার সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে না। বস্তুনিচয়ের প্রকৃতিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। মুমিন-বিশ্বাসীর বন্ধনহীন অনুভূতি ও সজীব ধারণা-ই মুক্ত স্বাধীন ইবাদত-উপাসনা। চিন্তা ও অনুভূতিগত ভ্রমণবিলাস, যা হৃদয়কে সতেজ করে; দৃষ্টিকে আলোকিত করে– যখন মস্তিষ্ক জগতে পুঞ্জিভূত নিদর্শন থেকে এর স্রষ্টার দিকে ধাবিত হয়। উপদেশ গ্রহণের এটাই হল মৌলিক ও বাস্তব পথ।

স্থান-কালের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে কুরআন সৃষ্টির সূচনা থেকে অভিচিন্তন-ধ্যানমগ্নতার প্রতি উৎসাহিত করে:

"বলো হে নবী, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। দেখো, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, এরপর কীভাবে তিনি পুনর্জন্ম দেন? আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (আল-আনকাবুত : ২০)

বর্তমানের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার জন্য যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি কালাচ্ছাদিত এবং আবাসনিশ্চিহ্ন বিগত জাতিদের স্মরণ করার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে :

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তখন তারা দেখতে পারবে যে তাদের চেয়েও শক্তিধর পূর্ববর্তী জাতিদের পরিণতি কী হয়েছিল।" (আল-রুম : ৯)

যেমন পার্থিব বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার আহ্বান জানায়, তেমনি পরকালের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রতিও আহবান করে :

"এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য নিদর্শনগুলো বর্ণনা করেন, যেন তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত বিষয়ে ভাবিত হতে পারো।" (আল-বাকারাহ : ২১৯-২২০)

কারণ নশ্বর পৃথিবীর সীমিত ভাবনা জগৎবিচ্ছিন্ন ভাবনা হিসাবেই প্রতিপন্ন হবে, মানব-অস্তিত্বের মৌলিক প্রকৃতিকে বিকৃত করবে।

তাই মুমিন সৃষ্টির সূচনা থেকে পরকাল পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে ভাবনার ব্যাপারে আদিষ্ট।

কিন্তু বস্তুনিচয়ের প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়েও স্বাধীন চিন্তাশীলতার দিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন যেমন আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট প্রাকৃতিক জগতের প্রতি দৃষ্টিদানে উদ্বুদ্ধ করে– যাতে মানুষের হাতের কোনো দখল নেই; যেমন- সপ্তাকাশ, পাহাড়, সাগর ইত্যাদি– তেমনি মানুষের সেবায় আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ সমাজ

যে আবিষ্কারের নেয়ামত-অনুগ্রহের ঢালা মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, তার প্রতিও মুমিন-বিশ্বাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধকরণে সহায়তা করে।

"আকাশ ও ভূমির সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে, মানবের উপকারী সাগরে ভাসমান জলপোতে, আকাশ থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বর্ষিত জলে– যা মৃত্যুর পর ভূমিকে সপ্রাণ করে, এতে নানা জীবজন্তু ছড়িয়ে পড়ে– বায়ু প্রবাহে, আকাশে ও ভূমিতে অনুগত বায়ুতে বুদ্ধিমান জাতির জন্য অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান।" (আল-বাকারাহ : ১৬৪)

কারণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন যদিও মানব-কর্তৃক সংঘটিত, তবু এ সকল জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার আয়ত্তাধীন।

"তিনি যতটুকু চান, তারা তার জ্ঞানের ততটুকুই আয়ত্ত করতে পারে।" (আল-বাকারা : ২৫৫)

"আমি তাকে পরিচ্ছদ-নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছি তোমাদের উপকারের জন্য। যেন দুর্ভোগ থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারো।" (আল-আম্বিয়া : ৮০)

তেমনি মানব-কর্তৃক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারসমূহও আল্লাহর প্রাকৃতিক রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের বাইরের কোনো বিষয় নয়। বরং আদতে তা এই নিয়ম-রীতির গভীরতাকেই প্রকাশ করে।

এজন্য সাগর-বিদীর্ণকারী বিশাল বিশাল জলপোতকে পাহাড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলেছেন। এমনকি কখনো তিনি জলপোতকে আপন সত্তার সঙ্গেও সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেছেন:

"সাগরে বিচরণশীল পর্বতসমান জলপোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন" (আল-রাহমান : ২৪)

সকল জলপোতই আল্লাহর। তেমনি এ যুগের আকাশযান, ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহসমূহসহ মানুষ উদ্ভাবিত সকল বিষয়-আশয়– সবই সমগ্র মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণায়-দয়ায়, আল্লাহর অনুমতিতেই আবিষ্কৃত।

"তোমাদের প্রভু যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান পরিচালনা করেন। যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। তিনি তোমাদের প্রতি দয়াশীল।" (আল-ইসরা : ৬৬)

এসময়ের কঠিন পরীক্ষা হল, আধুনিক কালে মানুষ যে সব উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেখিয়েছে; তা থেকে উপদেশ-গ্রহণের বিষয়টি মুমিন-বিশ্বাসী ভুলে যায়। কারণ এ উদ্ভাবনগুলো যে দেশ থেকে আসে, সে দেশ ইসলামে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহর একত্ববাদে আস্থাবান নয়। একই সময়ে সে দেখতে পায় যে, মুসলিম-বিশ্ব আধুনিক

সেবা পরিসেবা ও উদ্ভাবনে একান্ত ব্যর্থ হিসাবে পরিণত। বরং সে আরো প্রত্যক্ষ করে যে, মুসলিম দেশগুলো পরাভূত এবং এই সমস্ত দেশের আধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধাস্ত্রগুলোর সুবাধে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বৈধতা লাভ করে চলেছে। এই সকল অনুভূতি-প্রতিক্রিয়ার চাপে-প্লাবনে কখনো কখনো সমকালীন মুমিন-বিশ্বাসীর অনুভূতিতে-মনে আল্লাহ তায়ালার সবৃহৎ অনুগ্রহ, শক্তি-করুণার উদ্রেককারী প্রাকৃতিক সৃষ্টিনিচয় এবং কিছু দিক থেকে নেতিবাচকতার জনক আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তির মাঝে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের কতিপয় বিজ্ঞজনের মনে এই ধারণা-প্রবণতা এতোটাই গভীরভাবে প্রাথিত হয়ে পড়েছে যে, প্রাকৃতিক সৃষ্টিনিচয় ও আধুনিক মানব-উদ্ভাবনের মাঝেকার এই বিচ্ছিন্নতা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে।

আল্লাহ-সম্পৃক্ত-হৃদয় মানুষ ও জগৎ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা পোষণকারীগণ এ ব্যাপারে সদা সচেতন যে, এই ভূমণ্ডল এবং অভ্যন্তরীণ সকল প্রাণী, সকল বিষয়-সবই আল্লাহর বিস্তৃত রাজ্যে একটি পরমাণু মাত্র। আল্লাহই মানুষ এবং তার অর্জিত সকল কিছুর স্রষ্টা।

"আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের সকল ক্রিয়া-কর্মের স্রষ্টা।" (আল-সাফ্ফাত : ৯৬)

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অপমানজনক অবস্থার জন্য দায়ী মুসলিমদের কৃতকর্ম, যা আল্লাহর পদ্ধতিকে অস্বীকার করে।

এখানে একটি বিষয় স্মরণে রাখা দরকার। আর তা হল, কুরআন যখন *"সাগরে বিচরণশীল জলপোতসমূহ পাহাড়ের মতো"* (আল-রাহমান : ২৪) আয়াতের দিকে মক্কা-মদিনা ও পার্শ্ববর্তীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন এমন একটি সময় ছিল, যেখানে বিশাল বিশাল জলপোত তাদের হাতেই ছিল, যারা তখনও আল্লাহর মনোনীত ধর্ম গ্রহণ করে নি। আল্লাহ কিন্তু কাফের-অবিশ্বাসী কর্তৃক উদ্ভাবিত আল্লাহর নিদর্শনে চিন্তাশীলতা-অভিচিন্তনে নিষেধ করেন নি।

অদৃশ্য-বিষয়ে চিন্তামগ্নতা : এর সীমা-পরিসীমা

চিন্তাশীলতা/ ধ্যানমগ্নতা/ অভিচিন্তন একটি মুক্ত ইবাদত-উপাসনা। তবে একটি মাত্র বন্ধন এখানে থেকে যায়। আর তা হল খোদ আল্লাহর বিষয়ে চিন্তাশীলতা/ ধ্যানমগ্নতা/ অভিচিন্তন । আল্লাহ (*তার মতো কেউ নয়, তিনিই সম্যক শ্রোতা-দর্শক।* (আল-শুরা : ১১) স্থান-কালের গণ্ডি থেকে মুক্ত, অথচ সে স্থান-কালের নিগড়ে মানুষ বন্দি। কোনো ব্যক্তিই তাই কোনো বিষয়ে স্থান-কাল নিরপেক্ষ হয়ে ভাবতে সক্ষম নয়। তেমনি মানুষ যখন কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এতে সে পূর্বাভিজ্ঞতার প্রলেপ লাগাতে চায়। যেমন ধরুন, এমন একটি নতুন প্রাণীর ধারণার কথা, যা পুর্ব পরিচিত কোনো প্রাণীর সঙ্গে কোনো রকমের সামঞ্জস্য রাখে না। অথবা ভাবুন এমন একটি রঙের কথা, যা পূর্বে-দেখা রঙের সঙ্গে কোনোভাবেই মেলে না। তখন যত চেষ্টাই করুন না কেন, জীবজন্তু ও প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত পূর্বাভিজ্ঞতাই একটি আকৃতি নির্মাণে সহায়তা করবে। হয়ত মাথায় পাখা এবং পায়ে কান সংযোজন করবেন। কিন্তু কান, পাখা, পা সবই পূর্ব পরিচিত প্রাণীর শারীরিক অঙ্গ। তেমনি রঙের বেলায়ও একথা ঘটে। পূর্ব-পরিচিত রঙের সঙ্গে না মিলিয়ে নতুন কোনো রঙের আগমন ঘটবে না। এমনকি আমাদের এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ নির্দিষ্ট কম্পন ও তরঙ্গ-সীমার বাইরে কিছুই দেখতে পায় না, শুনতে পায় না– যে কম্পন ও তরঙ্গকে সহজেই অতিক্রম করে যায় তার চেয়ে ক্ষুদ্র পশু-পাখিও।

আমরা পূর্বে যে সত্য উপস্থাপন করেছি, তা আবারো জোর দিয়ে বলতে চাই। মানুষ যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কারণে মানুষ হিসাবে পরিণত, সে সম্পর্কে তার জানাশোনা সামান্য– অতি সামান্য। তার বুদ্ধি ও প্রাণের প্রকৃতি তো দ্বারবদ্ধ গুপ্ত ভাণ্ডার, রহস্য সাগর। এই যদি হয় নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের সীমা-পরিসীমা, তাহলে *"দৃষ্টি শক্তি যাকে অনুভব করতে পায় না, বরং তিনিই দৃষ্টিকে অনুভব করতে পারেন।"* (আল-আনআম : ১০৩), কালের পরিসীমায় যিনি আবদ্ধ নন, তাঁর সম্পর্কে চিন্তাশীলতা-অভিচিন্তনের সাহস দেখানো হবে কীভাবে? আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রা. বলেন যে, "তোমাদের প্রভুর কোনো রাত-দিন নেই। আকাশ-ভূমণ্ডলের আলো তার জ্যোতির অংশমাত্র। প্রলয়-দিবসে যখন রায় প্রদানের সময় হবে, ভূমি তার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"[৪৮] এজন্যই আলেমগণ জোর দিয়ে বলেন যে, "আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে তোমার হৃদয়ে যা উদ্ভূত হবে, তিনি বিপরীত।" ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কোনো এক জাতি আল্লাহর বিষয়ে ভাবছিল, নবী করিম (সা.) তাদের বলেন যে, "আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করো, ভাবতে থাকো। আল্লাহকে নিয়ে ভাবতে যেয়ো না। কারণ তোমরা তার পরিমাপ করতে পারবে না।"[৪৯]

---

[৪৮] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, আল-ফাওয়াইদ, পৃ : ২৩৫।

[৪৯] সুয়ূতি, 'আল-জামি আল- সাগির', প্রথম খণ্ড, দার আল-ফিকর, বৈরুত-১৯৮১, পৃ : ৫১৪। (ইবনে আব্বাস-এর বরাতে আবু নাইমের মাধ্যমে বর্ণিত 'আল-হুলইয়া' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

ইমাম জামাখশারি র. কুরআনের আয়াত *"আল্লাহ আরশে সমাসীন"* (তাহা : ৫) -এর ভাবার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ইমাম গাজ্জালি র. তখন একটি কবিতার মাধ্যমে চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। কবিতাটির অর্থ নিম্নরূপ:

"আমার কাছে কে জানতে চায়, তাকে বলে দাও এবং কথা সংক্ষেপ করো। কারণ এটা ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয়। এখানে গভীর গোপন রহস্য বিদ্যমান। আল্লাহর শপথ! বিদ্বানদের ঘাড়ও এখানে বেঁকে বসে। কোথায় তোমার আত্মা, কীইবা তার প্রকৃতি, তা কি দেখতে পাও? কীভাবে সে ঘুরে বেড়ায়? মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা কি নির্ধারণ করতে পারো? কখন তা নি:শেষ হবে, তুমি তা জানো না। হে মুর্খ! আমাকে বলো, যখন ঘুম পায়, তখন কোথায় থাকে তোমার বুদ্ধি-চিন্তা? খাদ্য-গ্রহণ কীভাবে চলে তোমার শরীরে, কীভাবেই বা তোমার জলবিয়োগ হয়? তা তোমার অজানা। তোমার পার্শ্বদেশের অভ্যন্তরের ভাঁজেই যদি এতো বিভ্রান্তি থাকে, তাহলে যিনি সেই আরশে সমাসীন, তার সম্পর্কে জানবে কী করে? বলো না কখনো, কীভাবে সমাসীন হলেন? কীভাবেই বা নেমে এলেন। মহাপ্রভুর বর্ণনা বা প্রত্যক্ষায়ণ কীভাবে সম্ভব? এটা একটা নিরর্থক কর্ম মাত্র। তার কোনো স্থান-অবস্থা নেই। তিনি স্থান-অবস্থার নিয়ামক-নিয়ন্তা। তাঁর প্রকৃতি, গুণাবলি ও শক্তি-ক্ষমতা তুমি যা বলো তা থেকে পবিত্র, অনেক উর্ধ্বে।"[৫০]

আল্লাহর গুণাবলিও তার অস্তিত্বের অংশ। ইবনুল কাইয়ুমের মতে আল্লাহর প্রকৃত সত্তা-সৌন্দর্য যেমন তিনি ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারে না, কেউ জানতেও পারে না; একই অবস্থা তার গুণাবলি সম্পর্কেও। তবে মুমিন-বিশ্বাসী লব্ধ বিশ্বাসের পরিমাপে আল্লাহর গুণাবলির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারে মাত্র– যা মূল সত্তার দিকে ধাবিত করে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "গুণাবলির কারণে সত্তা ঢাকা পড়ে আছে, গুণাবলি ঢাকা পড়ে আছে কর্মের কারণে। তাহলে পূর্ণতর গুণাবলির আবরণে যার সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে আছে, মহত্ত্ব ও নন্দনের গুণাবলিতে যার সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে আছে; তার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?"[৫১]

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহর সত্তা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার বিষয়ে মানুষকে নিষেধ করা হবে কেন? মানুষকে যতটুকু শ্রবণ, দর্শন, অনুভূতি, পঞ্চেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে, তার সাহায্যে কি মহান সত্তার অনুভব অসম্ভব? মৃত্যু, তার পরবর্তী বিষয়-আশয় তথা বারজাখ-আখেরাত সবই স্পষ্টত অদৃশ্য, পার্থিব কোনো রীতি-পদ্ধতির সাহায্যে এর অনুভবও তো সম্ভব নয়, তবু এ থেকে মানুষকে নিষেধ করা হবে না কেন? উত্তর হল: বাহ্যত এ সবই– যদিও পার্থিব জীবনে মুমিনের কাছে এর

---

[50] মুহাম্মদ ইবরাহিম আল-ফাইয়ুমি, 'আল-ইমাম আল-গাজালি ওয়া আলাকাতুল ইয়াকিন বিল-আকল', দার আল-ফিকর আরাবি, কায়রো, তারিখবিহীন, পৃ : ৩৮-৩৯।

[51] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'আল-ফাওয়াইদ', পূর্বোক্ত।

বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুপস্থিত– তবুও সর্বাবস্থায় এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিরই অন্তর্গত। পার্থিব জীবনেও এর সাদৃশ্যতা, উদাহরণ বিদ্যমান। যে ঘুমের রহস্য জানতে পারে, ভীতিকর স্বপ্ন ও সুখকর আনন্দদায়ক স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত হতে পারে, সে মৃত্যু ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় যথা কবর-বারজাখ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করতে সক্ষম হবে।

তেমনি গর্ভাশয়ের মানব-জীবন সম্পর্কে যে ভাববে, তারপর জন্ম এবং বয়োপ্রাপ্তির পরে জাগতিক জীবনের সঙ্গে যদি অন্ধকারের সেই জীবনের তুলনা করে; তাহলে পার্থিব জীবনের তুলনায় বারজাখের জীবনের ধারণা করতে সক্ষম হবে।

যদি গর্ভাশয়ের কোনো সন্তানের সঙ্গে আমাদের বাক্য-বিনিময়ের সুযোগ দেওয়া হয়, পার্থিব জীবনের প্রশস্ততা, এর চন্দ্র-সূর্য, গাছপালা, ফল-মূল ও নদী-নালার বিষয়ে; তাহলে সে এগুলো ধারণাও করতে পারবে না। কারণ তার অভিজ্ঞতা পার্থিব অন্ধকারকে অতিক্রম করতে পারে না। সে খাবার-পানীয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মুখাপেক্ষী নয়। তার খাদ্য, পানীয় চাহিদা পুরণ হয় গর্ভপরিস্রবের পথ দিয়ে আগত তৃপ্তিদায়ক তরলপদার্থের মাধ্যমে। তার জীবনের পক্ষে এ প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব অত্যাধিক। যখন জন্ম সম্পন্ন হয়, বেরিয়ে আসে আমাদের এই পার্থিব জগতে, তখন গর্ভপরিস্রবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। এই রশিনালা কেটে দেওয়া হয় এবং তুচ্ছস্থানেই ফেলে দেওয়া হয়। কেউ এর গুরুত্ব দেয় না। এর জন্য কোনো কবিও কাব্য রচনা করে না।

কিন্তু আমাদের এই পার্থিব জীবনে –যা সত্যি সত্যি একটি বিশাল গর্ভাশয়– শরীর নিজেই গর্ভপরিস্রবের কাজে নিয়োজিত হয়। এই দুনিয়ায়, পার্থিব জীবনেই মানুষ আল্লাহর ওহির বাণী শুনতে পায়, আখেরাতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, এর সুখ-দুঃখের সকল সংবাদ নবীর নির্দেশনায় জানতে পায়। তখন সে যেন পার্থিব গর্ভাশয়ে একটি শিশু মাত্র। যখন মৃত্যুর দিনক্ষণ আসে। খাপে খাপে মিলে যায়, আত্মার নিঃশেষীকরণ ঘটে; প্রশস্ততর বারজাখি জীবনে প্রত্যাবর্তন করে– যেখানে শরীরের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ঠিক সন্তানের জন্য গর্ভপরিস্রবের মতো। জীবন-বিচ্ছিন্ন তার সেই শরীরকে কবরে রাখা হয়। মানুষকে যেন এখানে একটি পর্যায়ের গন্তব্য থেকে উচ্চতর কোনো পর্যায়ের গন্তব্যে উপনীত হয়। সে যেন তাককরা ক্ষেপণাস্ত্র মাত্র, যখন একটি গন্তব্য শেষ হয়, ফুরিয়ে আসে জ্বালানি; রকেটের শরীর থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন তার শক্তি অনেক। একেবারেই ভারহীন। তাই ছুটে চলে প্রচণ্ড বেগে। একজন আরবীয় কবি এ বিষয়ে বেশ চমৎকার বলেছেন : "জীবন নিদ্রামাত্র, মৃত্যুই জাগরণ। মানুষ এর মাঝে শুধুই পরিভ্রমণকারী কল্পনা।"

ইমাম গাজ্জালি র. ছোটো কিয়ামত তথা ক্ষুদ্র প্রলয় যা মানুষের মৃত্যুর সময় ঘটে এবং বড় কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় যখন মানুষ আল্লাহর দরবারে জমায়েত হবে– এ দুটির মাঝে তুলনা করতে গিয়ে গর্ভাশয়ের সন্তান ও ভূমিষ্ট হওয়ার উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি বলেন:

"মানুষের দুটি জন্ম হয়ে থাকে। একটি হল পাঁজর ও শিরদাঁড়া থেকে গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে গমন। গর্ভাশয়ে সে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুস্থিত অবস্থানে থাকে। পূর্ণতার সন্ধানে তাকে কয়েকটি স্তর ও পর্যায় পেরুতে হয়। বীর্য, রক্তপিণ্ড, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি পেরিয়ে গর্ভাশয়ের সংকীর্ণতা থেকে বিশ্বের পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হয়। মহাপ্রলয়ের ব্যাপকতা থেকে ক্ষুদ্রপ্রলয়ের বিশ্লেষণের তুলনা বৈশ্বিক প্রশস্ততা থেকে গর্ভাশয়ের প্রশস্ততার সঙ্গে করা হয়েছে। মৃত্যুর পরে মানুষ যে জগতে পা রাখে, তার প্রশস্ততা পার্থিব জগতের প্রশস্তের তুলনা যেন বৈশ্বিক প্রশস্তার সঙ্গে গর্ভাশয়ের তুলনা। বরং মৃত্যু পরবর্তী জগতের প্রশস্ততা আরো বিস্তৃত, বড়।"[৫২]

তেমনি জান্নাতে প্রাপ্ত ফলমূল, প্রবাহিত নদ-নদী ও অপরূপ হুরের নেয়ামত-অনুগ্রহের সাদৃশ্য পার্থিব জগতেই বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যতা আনন্দ ও স্বাদগ্রহণের দিক থেকে যদিও অত্যন্ত নগণ্য তুলনা। রাসূল সা. জান্নাত সম্পর্কে বলেন, "সেখানে এমন সব বস্তুনিচয়-ব্যবস্থা বিদ্যমান, যার নমুনা তারা চক্ষু দিয়ে কখনো দেখে নি, কানে শুনে নি। এমন কি কারো কল্পনায়ও তা আসে নি।"[৫৩] দুনিয়া-আখেরাতের এই সাদৃশ্যতা কুরআনের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে :

"যারা ইমানদার এবং সৎকর্মশীল– তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, এর তলদেশে প্রবাহিত হয় নদ-নদী। যখন খাদ্য হিসাবে তাদেরকে ফলমূল দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এ খাবার আমরা পূর্বেই পেয়েছি। এখন এর সাদৃশ্য দেওয়া হল, সেখানে তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনসঙ্গী রয়েছে। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে। (আল-বাকারা : ২৫)

এভাবেই দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত-অনুগ্রহের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যতা মানুষের কল্পনায় আসে না।

জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। দুনিয়ার আগুন শরীরকে জ্বালিয়ে দেয়, চামড়া পুড়িয়ে ফেলে, সকল চিহ্ন নিদর্শন বিকৃত করে দেয়। এর দহন-ক্ষমতা কঠিন শাস্তি হিসাবে রূপ নিলেও মানুষ তা দুনিয়ায় কল্পনা করতে সক্ষম। এ জন্য অনেক আল্লাহ-ভীরু মানুষ অগ্নিকুণ্ড দেখে কেঁপে উঠতেন। কারণ তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় জাহান্নামের আগুনের কথা। এতে তার মাঝে ভীতি সঞ্চারিত হয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ এবং রাবি বিন খাইসাম ফুরাতের তীরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে কামারদের অগ্নি-প্রজ্বলন দেখতে পান– এর মাধ্যমে তারা লৌহযন্ত্র নির্মাণ করছে। তা দেখে রাবি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ইবনে মাসুদ তাকে উঠিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। কিন্তু ইবনে খাইসাম জোহর থেকে

---

[52] আবু হামিদ আল-গাজ্জালি, 'ইহ্য়াউ উলুম আল-দীন', পূর্বোক্ত, পৃ : ৬২।

[53] 'ফাত্হ আল-বারি' (ইবনে হাজার রচিত সহিহ আল-বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ।)

পরদিন ফজর পর্যন্ত সম্বিৎহারা ছিলেন।[৫৪] তাই বলা যায়, বিশাল পার্থক্য ও অনুমানের জটিলতা সত্ত্বেও মুমিন-বিশ্বাসী খুব সহজভাবেই জাহান্নামের আগুনের বিষয়ে ভাবতে সক্ষম হয়। রাসূল (সা.) একটি হাদিসে বর্ণনা করেন যে, "অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল হাজার বছর, এতে তা রক্তবর্ণের হয়ে যায়। আবার তা প্রজ্বলিত থাকে হাজার বছর, তখন তা হয় শ্বেত বর্ণ। আবার তা প্রজ্বলিত থাকে, তখন তা হয়ে যায় কৃষ্ণবর্ণ। এখন তা অন্ধকার কালো।"[৫৫] অন্য একটি হাদিসে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জাক্কুমের (দোজখের তিক্ত কন্টকযুক্ত ফল বিশেষ) একটি বিন্দু যদি পৃথিবীতে ঝরে পড়ে, তাহলে এর অধিবাসী সবার জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে।"[৫৬]

এজন্যই জ্ঞানী ও খোদাভীরু মানুষজন মৃত্যু, বারজাখ ও আখেরাত বিষয়ে অনেক ভেবেছেন, গভীর চিন্তা করেছেন। তাদের একজন হলেন আল হারিস আল মুহাসিবি, যিনি 'কিতাবুত তাওয়াহ্হুম' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে মৃত্যু-যন্ত্রণা, বেহেশতের সুখ, দোযখের আজাবকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। এই গ্রন্থে তিনি পাঠকের সামনে বাহ্যিক অদৃশ্য বিষয়গুলো দিয়ে পাঠককে এ নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সূক্ষ্ম। মনে হবে পাঠক স্বয়ং সেই জগতে শারীরিকভাবে উপস্থিত। মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং পরকালের উত্থান সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা একটু জেনে নিই :

"একটু ভাবুন, আপনি মৃত্যুমুখে পতিত। সেই হাশর মাঠে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ছাড়া আপনার মুক্তি নেই। ভেবে দেখুন, মৃত্যুর যন্ত্রণা, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, গোঙানি। মৃত্যু-দূত পায়ের দিক থেকে আপনার আত্মাকে টেনে নিচ্ছে। এই টেনে নেওয়ার ব্যথা আপনি অনুভব করছেন পায়ের নিচ থেকে। আপনি সেটাকে সহনীয় করার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু উৎপাটনের কাজ পুরোদমে চলছে। যেন সমস্ত শরীর থেকে আপনার আত্মাকে বের করা হচ্ছে। শরীরের নিম্নভাগ থেকে এর ব্যথা উর্ধ্বভাগে যেতে থাকে। আপনার কষ্ট, আপনার দুর্ভোগ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। মৃত্যু যন্ত্রণা ছেয়ে আছে পুরো শরীরে। দৃষ্টি তুলেছেন আপনি ফেরেশতার দিকে, দেখছেন তার দুহাত আপনার মুখ গহ্বরে প্রসারিত। যেন আপনার আত্মাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এবংবিধ দর্শনে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু আপনার হৃদয় জুড়ে অকস্মাৎ সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে; যখন আপনি শুনতে পান ফেরেশতার কণ্ঠ : "সুসংবাদ হে আল্লাহর ওলি! তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের। সুসংবাদ হে আল্লাহর দুশমন! তার অসন্তুষ্টি ও শাস্তির।"

---

[54] আহমদ বিন হাম্বল, 'কিতাব আল-জুহ্দ', দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত-১৯৮৩, পৃ : ৩৯৮।

[55] ইমাম মুহাম্মদ বিন সুলায়মান, 'জামউল ফাওয়াইদ', ফায়সাল ইসলামি ব্যাঙ্ক প্রকাশনা-১৯৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ৮৫২। (উক্ত গ্রন্থে হাদিসটি ইমাম মালিক ও তিরমিজি সূত্রে বর্ণিত।)

[56] ইবনে আব্বাসের সূত্রে ইমাম আহমদ কর্তৃক রচিত মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত।

"যখন মৃত্যুর পর সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন। এখন এখানে কোনো অধিবাসী নেই, শুধুই ভূমি- শুধুই আকাশ। অনেক আলোড়ন-বিলোড়নের পর তারা নিস্তব্ধ। কোনো কোলাহল নেই, নেই কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি। শুধু সেই পরাক্রমশালী মহাপ্রভু, যেমন আছেন অদ্বিতীয় এককভাবে আপন মাহাত্ম ও মহত্ত্ব নিয়ে। হঠাৎ আপনার আত্মা সৃষ্টিজীবের প্রতি এক ব্যাপক আহ্বান ও ঘোষণার মুখোমুখি। ভেবে দেখুন, আপনার শ্রবণে-অনুভবে কেমন সেই ধ্বনির পতন। ভেবে দেখুন নিজ বুদ্ধি দিয়ে. সেই মহান প্রভু শাহানশাহের দরবারে আপনাকে আহ্বান করা হচ্ছে। সেই আহ্বানে আপনার হৃদয় কম্পিত, কেশ শুক্লপ্রায়। হঠাৎ একটি ধ্বনিতে চমকে উঠলেন, যখন শুনতে পেলেন যে, ভূমি থেকে আপনাকে শির উত্তোলন করতে হবে। আপনি লাফ দিয়ে দাঁড়ালেন। আপনার আপাদমস্তকে কবরের মাটি লেগে আছে। নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আহ্বানের জন্য উৎকণ্ঠিত। সমস্ত সৃষ্টিজীব আপনার সঙ্গে সমুত্থিত। যে মাটির সংলগ্নতায় তাদের দুর্ভোগের দীর্ঘায়ন, তার চিহ্ন সর্বত্র। কল্পনা করুন, তাদের উত্থানের ভয় ও শঙ্কামিশ্রিত সামগ্রিক দৃশ্যটি। নিজের অবস্থাটি ভাবুন, বস্ত্রহীন ও সম্মানহীনতার। আপনার ভাবনা, আপনার দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকূলের ভিড়ে; উদোম শরীর, নাঙা পা, ভয়-শঙ্কায় অপদস্ত, অপমানে সবাই নির্বাক। শুধুই পদধ্বনি। সকল রাজা রাজ্য থেকে উৎখাত, অপমান-অসম্মান তাদের জেঁকে বসে আছে। পৃথিবীর জীবনে মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচারের পরিণামে আজ এখানে তারা মান-সম্মানের দিক থেকে সর্বনিম্নে। মানুষ-জিন, শয়তান, পশু-পাখি, চতুষ্পদ-জন্তু, অর্থাৎ সবার উত্থানেই পরিপূর্ণ। একই সঙ্গে সবাই হিসাব ও প্রশ্নের মুখোমুখি। আকাশের সকল তারকা উপর থেকে ঝরে পড়েছে। চাঁদ-সূর্য নিশ্চিহ্ন। পৃথিবীর সকল প্রদীপ নির্বাপিত, জ্যোতি উধাও। তখনই সৃষ্টিকূলকে নিয়ে আপনি দেখতে পেলেন দুনিয়ার সেই আকাশ মানুষের মাথার উপর বিশালতাসহ ঘুরে চলেছে। আপনি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চলেছেন। হঠাৎ পাঁচশো বছরের গাঢ়তা নিয়ে তা খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেল। খণ্ডিতকরণের সে কি বিকট ভয়ঙ্কর আওয়াজ! এরপর তা টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকে। বিভিন্নপ্রান্তে ফেরেশতাকূল দণ্ডায়মান। আল্লাহ একে দ্রবীভূত করেছেন। যেন তা বিগলিত রৌপ্য; হলদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রলয়দিবসের ভয়ঙ্করতার। আল্লাহ নিজেই বলেছেন : *"তা রক্তের রঙ্গে রঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করে।"* (আর-রাহমান : ৩৭)

তিনি আরো বলেন : "এরপর ডান বা বাম হাতে কৃতকর্মের ফর্দ ধরিয়ে দেওয়া হবে। তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে। আপনি গুরুত্বসহকারে স্থাপিত তুলাদণ্ড নিয়ে ভাবতে থাকুন। আপনার হৃদয় প্রতীক্ষারত। তারপর কর্মের ফল ডান হাতে না বাম হাতে যাবে, এই সংশয়ে দ্বিধান্বিত। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সৃষ্টিকূলের কাতারে। হঠাৎ চোখে পড়লো ফেরেশতা। তার প্রতি নির্দেশ হল নরক-প্রহরীদের উপস্থিত করানোর। তারা লোহার হাতুড়ি নিয়ে উপস্থিত। তাদের দেখা মাত্রই ভয়ে-শঙ্কায় আপনার হৃদয়-পাখি উড়ে গেল। এভাবেই আপনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আপনার নাম

উচ্চারিত হল, আদি-অন্তকালের সকল সৃষ্টি জীবের সম্মুখে আপনার নাম আহ্বান করা হলো : অমুকের সন্তান অমুক কোথায়? ভাবুন যখন আপনি প্রকম্পিত, বিধ্বস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের হাত আপনার বাহু জড়িয়ে ধরছে। ধরার কৌশলে দৃঢ়তা। যেন তাদের হাতেই বন্দি। আপনাকে টেনে নিল আল্লাহর আরশ পর্যন্ত। যেন তাদের হাত দিয়ে আপনাকে ছুঁড়ে মেরেছে। আল্লাহ তখন বলে যাচ্ছেনঃ হে আদম সন্তান, কাছে আসো। তার নূর-জ্যোতিতে আপনি নিমগ্ন। দাঁড়িয়ে আছেন মহান পরাক্রমশালী দয়ালু প্রভুর সামনে, চিন্তিত বিধ্বস্ত হৃদয়ে যেন অন্তঃস্থ শিশু এখন ভূমিষ্ট হবে। সর্ব সময়ে উপকারী, সহায়ক, বিপদ-তাড়ক মুনিবের সম্মুখে দাঁড়ালে লজ্জা ও ভীরুতার অন্ত থাকে না। যখন আপনার বৃহৎ পাপ, বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন, তখন আপনার জিহ্বা কী উত্তর দেবে?"[৫৭]

আখিরাত বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনার পরই আল-হারিস আল-মুহাসিবি তা লিখেছেন। প্রলয়-দৃশ্য সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বর্ণিত বিনয়ী প্রত্যাবর্তনকারী ভাবনার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে, কোনো আলেম, মুজাহিদের বক্তব্য থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরাই ফলদায়ক। সূরা আল-তাকভিরের ব্যাখ্যায় শহিদ সাইয়েদ কুতুব যা বলেন, তা বিবৃত হল :

"যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে, যখন তারকারাজি খসে পড়বে, পাহাড়সমূহ সচল হবে, গর্ভবতী উষ্ট্রী হবে পরিত্যক্ত, বন্যজন্তু জমায়েতকৃত, সাগর স্ফীত, দেহ হবে আত্মা-সংযোজিত এবং জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে, কোন পাপে সে নিহত?" (আল-তাকভির : ১-৯)

নির্দিষ্ট প্রতিটি বস্তুর জন্য এ এক বিপ্লব-পূর্ণ দৃশ্য, প্রতিটি অস্তিত্বের জন্য ব্যাপক আন্দোলন-অভ্যুত্থান; যে অভ্যুত্থান-বিপ্লব আকাশ এবং ভূমির প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রাণী, বন্য পশু-পাখি, পালিত জীবজন্তু, মানব-প্রাণ ও সকল অবস্থাকে সমন্বিত করে। এতে সকল আবরণ খুলে যাবে, অজানিত বিষয় বিদিত হবে, প্রতিটি প্রাণের সম্মুখে হিসাব ও নিরীক্ষার পুঁজি, সম্বল উপস্থাপিত হবে। এর চারপাশের সকল বিষয়-আশয় তীব্রগতি সম্পন্ন, হবে পরিবর্তিত।

জগৎ সংসারের এ বিশাল কর্মকাণ্ড আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলকেই ইঙ্গিত করে : সুবিন্যস্ত-সুন্দর, পরিমিত কম্পন-সমৃদ্ধ, গভীর-সম্পর্কিত সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও নিখুঁতভাবে নির্মিত পৃথিবী। তবে এই পৃথিবীর গিঁট খুলে যাবে, অংশগুলো ছড়িয়ে পড়বে, যা গুণ-উপাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত– তা বিলীন হয়ে যাবে, নির্ধারিত সময়ের পর তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সৃষ্টিকূল তখন জীবনের ভিন্নতর প্রকৃতি, পৃথিবীর ভিন্নতর রূপে প্রতিভাত হবে, নির্ধারিত পৃথিবীর সর্বশেষ প্রতিকৃতি থেকে যা একেবারে স্বতন্ত্র।

---

[57]আল-হারিস আল-মুহাসিবি, 'কিতাব আল-তাওয়াহুহুম', দার আল-ওয়ী, হালব, সিরিয়া, পৃ : ১-১৮।

এই সূরা এইভাবেই অনুভূতিতে, হৃদয়ে স্বীকৃতির বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়। যেন সে প্রকাশ্য বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে – অন্তত যতটা সম্ভব– চিরন্তন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সে হল আল্লাহর প্রকৃতি-সত্তা, যার কোনো বিববর্তন-পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। এমনকি অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন প্রতিটি বস্তু নড়ে উঠবে, বিলীন হবে, তখনও। দৃশ্যমান জগতের পরিচিত বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ও ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সত্তার দিকে ছুটে যাবে। কারণ দৃশ্যমান কোনো সীমানাতেই তাকে ধারণ করা যায় না।

এ হলো সেই ব্যাপক অনুভূতি যা প্রাণের গভীরে ঢুকে পড়ে। সে প্রত্যক্ষ করে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের, অভ্যুত্থানের দৃশ্যসমূহ।

কিন্তু জগৎ-সংসারের প্রতিটি সত্তায়-অস্তিত্বে বাস্তবে কী ঘটে, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে। আমাদের অনুভূতি, চিন্তা ও পরিচিতির যে শর্তযুক্ত ধারণা রয়েছে, তার মাধ্যমে যা বুঝতে পারি; তা এর থেকেও অতি সামান্য। কিন্তু অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের যে বিকট পরিচিতি পাই, তা হল ধ্বংসাত্মকভাবে ভূমিকম্পন, অথবা অভ্যন্তরের বিস্ফোরণ– যাতে ব্যাপক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়, ছোট্ট কোনো উলকার ভূমিপতন, অথবা বজ্রাঘাত। মানব-জাতি জলের যে অবাধ্যতার পরিচয় জানতে পারে, তার তীব্রতার পরিচিতি হল প্লাবন, তেমনি জাগতিক ঘটনা-প্রত্যক্ষণের তীব্রতা হল মিলিয়ন মিলিয়ন দূরত্বে অবস্থিত সূর্যের অভ্যন্তরে খণ্ডিত বিস্ফোরণ।

এ হল প্রলয়ের ব্যাপক বিধ্বংসী বিপ্লব-অভ্যুত্থানের তুলনায় সামান্য বর্ণনা মাত্র। শিশুপ্রবোধ-কর্ম। জগতে যা ঘটে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যেহেতু অসম্ভব; হলে, তখন জীবন-যাপনে পরিচিত শব্দ দিয়ে একটি নৈকট্য ও সেতুবন্ধন রচনা করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় থাকে না!

সূর্যের একীভূত-পিণ্ডকরণ মানে শীতলতা, এর অগ্নি নির্বাপিত হওয়া। হাজার হাজার মাইলের শূন্যতা জুড়ে যে আগুনের টগবগানো বিদ্যমান, তার স্তিমিতি। সূর্যগ্রহণকালে তা মানমন্দির থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১২,০০০ ডিগ্রির তাপে তা জ্বলন্ত গ্যাসে পরিণত হয়। সূর্যের সকল উপাদানই এই তাপে জ্বলন্ত গ্যাসে পরিণত হয়। এই অবস্থা থেকে মাটির মতো এর শীতলায়ন ও একীভূতকরণ– এর কোনো ভাষা নেই, বিস্তার নেই।

এমনও হতে পারে, আবার এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। কিন্তু তা কীভাবে হবে, কী কারণে হবে– এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে।

তারকার নিস্প্রভতা মানে যে শৃঙ্খলায় তা আবদ্ধ, তার ছিন্নকরণ। আলোকহীনতা, বরং শুধুই অন্ধকারাচ্ছন্নতা। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, কীভাবে তা ঘটবে। একি আমাদের নিকটের কোনো তারকামণ্ডল যা আমাদের সৌরজগৎ বলে

পরিচিত। নাকি মিলিয়ন মিলিয়ন তারকার ছায়াপথ। নাকি সকল তারকাই, যার সংখ্যা-অবস্থান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানমন্দির থেকে আমরা যা দেখতে পাই তার পেছনে অসংখ্য শূন্যতা, অসংখ্য ছায়াপথ– যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এর মাঝেই তারকাগুলো নিস্প্রভ হবে, যেমনটা সন্দেহহীন সত্য সংবাদ বর্ণনা করলো– এর প্রকৃতি আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই।

পাহাড়ের পরিভ্রমণ মানে হল ধুলোর চূর্ন-বিচূর্ণ মতো হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। যেমন- অন্য একটি সূরায় এসেছে *"আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। বলুন আমার প্রভু তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।"* (ত্বাহা : ১০৫) *"পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, ধুলোবালির মতো বিক্ষিপ্ত হবে।"* (আল-ওয়াকিয়া : ৫) *"পাহাড়কে চূর্ণ করা হবে, তা মরীচিকায় পরিণত হবে"* (আল-নাবা : ২০) এসবই একটি বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে যা পাহাড়কে স্পর্শ করবে। তখন এর স্থায়িত্ব-দৃঢ়তা, কঠিনতা-অটলতা সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে এর সূচনা হতে পারে ভূ-কম্পনের মতোই কোনো আয়োজনে। যার বিষয়ে কুরআন বলছে *"যখন ভূমি কেঁপে উঠবে। ভূমি অভ্যন্তরের সকল ভার উগড়ে দেবে।"* (জালজালাহ : ১-২) এ সবই ঘটনা পরম্পরা। যা দীর্ঘায়িত দিনে সংঘটিত হবে।

"জীবজন্তু যখন জমায়েত হবে" –এই বন্য জীবজন্তু ভয়ে মথিত, শঙ্কায় কুণ্ঠিত। তাই জমায়েত হয়েছে এবং সংকোচিত হয়ে একত্রিত হয়েছে। এসবই আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ভয়ে একত্র হয়েছে। পারস্পরিক শঙ্কা-সংঘাত ভুলে গেছে। তেমনি এর শিকারীর কথাও বিস্মৃত। ধাবিত হচ্ছে সামনের দিকে। স্বভাবসিদ্ধভাবে গর্তে বা আবাসে ফিরছে না। তারা শিকারের পেছনে ও দৌড়ায় না, যেমনটা তার স্বভাব। ভীতি এবং শঙ্কা এই সমস্ত জীবজন্তু বন্য প্রাণীর বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি পাল্টে দেয়। তীব্র ভীতির সময়ে মানুষের অবস্থা কী হবে?

সাগর উত্তাল করা মানে পানিতে একে পরিপূর্ণ করে দেওয়া। হয়ত এই পানি প্লাবনের কারণে আসবে। যেমনটা বলা হয় যে, তা ভূপৃষ্ঠের জন্ম এবং এর শীতলতার সঙ্গে জড়িত। (সুরা আল-নাজিয়াতেও এর বিবরণ বিদ্যমান।) অথবা ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির কারণে, যা সাগরের প্রাচীর-প্রাকার ভেঙে দেবে, একে অপরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে টগবগিয়ে উঠবে অথবা এর অর্থ হবে প্রজ্বলন-বিস্ফোরণ। যেমন অন্য আয়াতে আছে *"সাগর যখন বিস্ফোরিত হবে।"* তখন এর উপাদানগুলোর বিস্ফোরণ, অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেনের বিচ্ছিন্নতা অথবা পরমাণু বিস্ফোরণের মতো আণবিক বিস্ফোরণ। এটা সবচে ভয়ঙ্কর। অথবা অন্য যে কোনোভাবে তা হতে পারে। এটা যখন ঘটবে, তখন সাগর থেকে যে ভীষণ অগ্নিবলয়ের সৃষ্টি হবে, তার বিস্তৃতি অনুমানযোগ্য নয়। কারণ হাইড্রোজেন বা আণুবিক বোমার সীমিত বিস্ফোরণ যে ভীতির সৃষ্টি করে, তা পৃথিবীর এখন বেশ ভালো করেই জানা। তাই সাগরে যদি

আনুবিক বিস্ফোরণ অথবা অন্য কোনোভাবে তা ঘটে, তাহলে ভীষণতার কল্পনায় মানুষের অনুভব-শক্তি সত্যি অক্ষম। তেমনি বিস্তৃত সাগর থেকে নারকীয় যে ভয়ঙ্করতার সৃষ্টি হবে, তা ধারণা করতেও অপারগ।

প্রাণের সমন্বয়ন হতে পারে পুনরুত্থানের মাধ্যমে শরীর ও আত্মার একীভূতকরণে। হতে পারে একজাতীয় সকল আত্মাকে একত্রিতকরণ। যেমন অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে : *"তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিলে।"* (আল-ওয়াকিয়া : ৭) সেই তিনটি দল হল, নিকটবর্তীগণ, সৌভাগ্যবানগণ ও অভাগার দল। অথবা এমন আর কোনো প্রজাতি গঠনের মাধ্যমে।"[৫৮]

জগতের নানা বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তার গুরুত্ব স্পষ্ট করার জন্য এতোটুকু যথেষ্ট। স্থান-কাল, দুনিয়া-আখেরাতের শর্তমুক্ত হয়ে তা চলতে পারে। এই অস্তি জগতে আল্লাহ এবং তার সৃষ্টিজীব ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু আল্লাহর মূলসত্তা বিষয়ে চিন্তাশীলতা/ অভিচিন্তন মুমিন-বিশ্বাসীর জন্য নিষিদ্ধ। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে অন্য যে কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভাবতে সক্ষম হবে, পারগ হবে।

---

[58] সাইয়দ কুতুব, পূর্বোক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড।

চিন্তাশীলতার স্তরে স্তরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পার্থক্যসমূহ

এখানে চিন্তাশীলতা ও অভিচিন্তনের একাধিক স্তর বিদ্যমান। তাহলে কোনো কোনোটার প্রয়াস-পরিমাপে প্রতিদান-সোয়াব দেওয়া হবে? অর্থাৎ মুমিন-বিশ্বাসী যে বিষয়ে ভাবিত হন, তার একক-স্বকীয়তা ও বৈশিষ্টানুসারে? এর জবাব দিতে গেলে এমন কিছু রহস্যজনক উপাদান এবং সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়, যার সম্যক অনুধাবনে, আত্মস্থকরণে মানব-মস্তিস্কের কোনো ক্ষমতা নেই। আমার মতে বাহ্যত এখানে আটটি স্তর বিদ্যমান। যা পরিবর্তনশীল, পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট-প্রবণ; এর মাধ্যমেই পার্থক্যগুলো সূচিত হয়। নিম্নে এর আলোচনা পেশ করা হল:

ক) ঈমান-বিশ্বাসের গভীরতা

অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতার গভীরতা প্রথমেই নির্ভর করে ব্যক্তির ঈমান ও আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রকৃতির উপর। এটা এমন এক স্বতন্ত্র বিষয়, যার সম্যক পরিচয় আল্লাহর কাছেই। এরপর অবশ্য মুমিন-বিশ্বাসীও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যখনই মুসলিমের ঈমান-বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটে, তখনই আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যে নিমগ্ন হতে পারেন সহজে। ভীতি এবং ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অভিচিন্তন তিনটি স্তর পেরিয়ে আসে। সূচনাকেন্দ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তর, সৌন্দর্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের উপভোগের স্তর এবং সৌন্দর্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের উপভোগের পথেই মহান স্রষ্টার অভিমুখে ফিরে চলে মানব-আগ্রহ। কারণ যখনই মানুষের ঈমান বেড়ে চলে, আল্লাহ-ভীতি ও তাঁর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়; তখনই সেই পরিমাপে আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে তার চিন্তা-গবেষণা গভীরতর হয়। অভিচিন্তন ও ধ্যানমগ্নতা যখন উষ্ণ আত্মিক অনুভূতিগত অবস্থার মাঝে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে, তখন সে শীতল জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তর ও উপভোগের স্তর পেরিয়ে মূল্যবান সেই তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। আল্লাহর স্মরণ ও চিন্তনে উদ্যোগী ব্যক্তির গুণও তখন এর সত্যায়ন করে। অনুভূতিগত এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, একসময় তা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সহ্যসীমাকে অতিক্রম করে যায়।

বিভিন্ন আল্লাহ-ভক্ত মানুষজনের সত্য অভিচিন্তনের অবস্থা বিবেচনা করে আমরা অবাক হই। এদের কারো কারো ধীর ভাবনার মাধ্যমে কাজের সূচনা ঘটে, এক সময় সে এই ভাবনায় এতোটাই নিমগ্ন হয় যে, পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থা তার কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন- দাউদ তায়ি'র একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি আকাশ ও ভূমণ্ডলের ভাবনা-চিন্তার জন্য শুক্লপক্ষের রাতে ঘরের ছাদে উঠেন। তখন তিনি আকাশ দেখতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। হঠাৎ করে তিনি পড়শির ঘরে ঢুকে পড়েন। পড়সি শয্যা থেকে উঠেই তাকে চোর ভেবে তলোয়ার হাতে নেয়। কিন্তু যখন

দাউদের পরিচয় জানতে পারে, তখনই নিজেকে সংবরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে কে ছাদ থেকে আপনাকে কে ফেলে দিল? উত্তরে দাউদ বলেন: শপথ আল্লাহর, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।[৫৯]

খ) মানসিক কেন্দ্রীভূতকরণে সক্ষমতা

চিন্তার গভীরতা সীমা-পরিসীমার মৌলিক ও প্রথম উপাদান হল অভিচিন্তকের বিশ্বাস ও তার আল্লাহ-পরিচিতির স্তর ও পর্যায়। দ্বিতীয় উপাদান যা মুমিন-বিশ্বাসীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য, তার ব্যক্তিক গুণাবলি এবং মানসিক কেন্দ্রিভূতকরণে তার স্বভাবগত শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য এর মাধ্যমে সে কোনো রকমের ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করে না। এই বৈশিষ্ট্য পুরোটাই নির্ভর করে আল্লাহ-প্রদত্ত স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর।

অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক গবেষণা বিদ্যমান, যা মানসিক কেন্দ্রীভূতকরণে এবং এতে ধৈর্যধারণের ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষ ভেদে বিভিন্ন রকমের পার্থক্যের সূচনা করে। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা– যা বহির্মুখী ও আন্তর্মুখী স্বভাবের লোকদের উপর পরিচালিত– তা ইঙ্গিত করে যে, মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে এই বাহ্যিকতার একটি আঙ্গিকগত মৌলিক গুরুত্ব বিদ্যমান। যার একান্ত বিশ্বাস যে, জালিকাময় বিন্যাস-প্রক্রিয়া এবং এর থেকে মস্তিষ্কগামী স্নায়ুতন্ত্রের অভ্যন্তরে সক্রিয় জালের পদ্ধতি লুকিয়ে আছে। এই স্নায়ুবিক সজ্জা-বিন্যাস যা মস্তিষ্কের কাণ্ডে গুঁজে থাকে এবং উচ্চতর মস্তিষ্কের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, তা ফটকের ভূমিকা পালন করে– যা স্নায়ুবিক কম্পনে, মস্তিষ্কের উর্ধ্বগামী প্রেরণার নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। কোনো কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরে স্নায়ুবিক সংকেতের জালিকাময় সজ্জা-বিন্যাস, অনুভেবভেদ্য বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছায়। ব্যক্তি তখন তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিসম্পন্নতার দরুন দীর্ঘ সময়ের জন্য মানসিক কেন্দ্রীভূতকরণের ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যেমন তার জন্য প্রতিবেশ-উদ্ভূত অনুভূতিগত উদ্দীপক প্রেরণার সামান্য স্পর্শই যথেষ্ট। তখনই সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, ফিরে যায় একাকিত্বে, নিবিষ্ট হয় অন্তর্গত ভাবনায়। উচ্চ আওয়াজ, সাঙ্গীতিক শোরগোল বা হৈহল্লা ধরনের কোনো কাজের ক্ষমতা রাখে না। আত্মমুখিনতা মানব-সংসর্গ থেকে, উদ্দীপক কর্মের নিমগ্নতা ঘটতে পারে– এমন যে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখে; বরং এর বিরোধী প্রণোদনাকেই প্রাধান্য দেয়। তখন সে এককভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ কাজে অথবা নিজ উদ্যানের পরিচর্যায় বা পাঠ-পঠনে ব্যস্ত থাকে। শুধু রুটিনমাফিক কাজ-কর্মের স্বাদ অনুভব করে , কোনো ক্লান্তি ও বিরক্তি ছাড়াই। সমবেত প্রার্থনা ও নামাজেও আপন রহস্যকে লোকাতে তৎপর। মনের কথা মুষ্টিমেয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কাউকেই খুলে বলে না। তেমনি জীবনকে

---

[৫৯] আবু হামিদ আল-গাজালি, 'ইহয়াউ উলুম আল-দিন', পূর্বোক্ত, পৃ : ৩৮৮-৩৮৯।

নিশ্চিত প্রকল্পের মতো ভেবে নিয়ে কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করে নেয়। তার অনুভবের প্রকাশ ঘটে খুব অল্প, শত্রুতামূলক, রাগান্বিত সরাসরি কোনো আচরণও কম করে থাকে। এজন্যই মনস্তাত্ত্বিক অনেক নিরীক্ষামূলক গবেষণার ফল এমন হয়, যা এ ব্যাপারে তাগিদ দেয় যে– এই সমস্ত ব্যক্তিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীভূতকরণের কাজে উদ্যোগী হতে পারে, তেমনি পরিশ্রম ও অবসাদের কারণে যে ভ্রান্তিগুলো ঘটার সম্ভব না থাকে, তা থেকে মুক্ত থাকে বিশেষভাবে।

এই প্রকারের মানুষের কাছে তার ঈমান-বিশ্বাস ও কুফর-অবিশ্বাসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেও আমরা এটা প্রত্যাশা করতে পারি যে, দীর্ঘ সময় সে চিন্তন-প্রণোদনায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতে পারে। একই সঙ্গে সে যদি মুমিন-বিশ্বাসী ও চিন্তশীল হয়, তখন স্বভাবজ স্নায়ুবৈশিষ্ট্যের কারণে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য সে আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তামগ্নতার কাজ অব্যাহত রাখতে পারে। এছাড়া অন্যান্য মানুষের তুলনায় আরো অনেক গভীরতর ভাবে তা সম্পন্ন করতে পারে।

প্রকারান্তরে যারা মানুষের জালিকাময় নির্মাণ-সজ্জা ও উর্ধ্বমুখী স্নায়ুতন্ত্রকে হাতের ইশারায়, উর্ধ্ব মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উত্থিত স্নায়ুকম্পনে এবং এর তেজস্বিতা হ্রাস করার মাধ্যমে ঠিক করে, তারা উপর্যুক্ত গোষ্ঠীর বিপরীতে। তারা যাপিত-প্রতিবেশের উদ্দীপনা প্রবলভাবে প্রত্যাশা করেন। তাই দেখা যায়, জালিকাময় নির্মাণ-সজ্জাকে সঠিক করার জন্য তারা হাতের ব্যবহার করে থাকেন। অথবা বলা যায়, স্নায়ুতন্ত্রের সমর্থকগণ এমনই বলে থাকেন।

এজন্যই দেখা যায় যে, বহির্মুখী স্বভাবের লোকজন সাধারণত সভা সমাবেশ পছন্দ করে। অসংখ্য বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করে। কারণ সে উদ্দীপনার প্রতি আগ্রহী, দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ও ধারাবাহিক আড্ডাবাজিতে উৎসাহী। একাকিত্বে অতীষ্ট হয়ে পড়ে, পাঠে অনাসক্ত, রুটিনমাফিক কর্ম-প্রণোদনায় বিরক্ত। এক আবাস থেকে অন্য আবাসে স্থানান্তর-প্রবণ, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় পরিবর্তন প্রত্যাশী ইত্যাদি ইত্যাদি। রকমারি খাদ্য, বন্ধু-বান্ধব ও একাধিক জীবনসঙ্গীর প্রতি তার বিশেষ টান। তার অভ্যন্তরীণ অনুভব-অনুভূতি গোপন থাকে না। কখনো তা সহিংসতার রূপ নেয়। ক্রোধ এবং প্রশমন ঘটে খুব দ্রুত। একই পদ্ধতিতে বারংবার কৃত কোনো কষ্ট বা অব্যাহত মানসিক কেন্দ্রিভূতীকরণের কোনো কাজই তার কাছে গুরুত্ব পায় না। একাধিকবারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে এটা প্রামাণিত যে, বাইর্মুখী স্বভাবের লোকজন অধিক ভ্রান্তি-প্রবণ, আত্মমুখী লোকজনের তুলনায় মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত অমনোযোগী।

এজন্যই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ঈমান-বিশ্বাস ও জীবন-যাপনের স্তরে সমকক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ স্নায়ুবিক নির্মাণের কারণে অন্যদের তুলনায় চিন্তার দৈর্ঘ্য ও গভীরতায় অত্যন্ত অসহিষ্ণু।

আমরা যদি মেনে নিই যে, চিন্তাক্ষেত্রে বহির্মুখী স্বভাবীদের তুলনায় অন্তর্মুখী স্বভাবীদের মর্যাদা বেশি, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, এর কারণে ব্যাপকভাবে তাদের মানহানি ঘটছে। স্নায়ুবিক এবং মানসিক নির্মাণের গুণেই কখনো কখনো তারা বিভিন্ন ধর্মীয় ক্ষেত্রে– যা মানব-সমাজের সংস্রবে উদ্বুদ্ধ করে, বন্ধুতার সন্ধানে উৎসাহিত করে– অধিক মর্যাদার অধিকারী। যেভাবেই হোক, অধিকাংশ মানুষের সংখ্যাই হল অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখীর মাঝামাঝিতে। অন্তর্মুখিনতা ও বহির্মুখিনতার প্রভাবে এ সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

গ) সংবেদনশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা

তৃতীয় উপাদান হল, মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রকাশ্য একটি দিক, যার কোনো ব্যাখ্যা-বর্ণনার প্রয়োজন নেই। চিন্তাশীলতা/ অভিচিন্তনের জন্য প্রশান্তি, মানসিক স্বস্তি এবং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা একান্ত প্রয়োজন। স্বাভাবিক হিসাবে শারীরিক সুস্থতার আলোচনা না করলেও গূঢ় উদ্বিগ্নতা, শরীর-হানিকর দুশ্চিন্তা, প্রভাবশালী সন্দেহ অথবা ভীতিকর অসুস্থতার ধারণা ইত্যাদি তীব্র মনোবৈকল্যের অস্থিরতায় আক্রান্ত মুমিন-বিশ্বাসীর কাছে উচ্চ পর্যায়ের গভীরতা ও মনোযোগিতা-সম্পন্ন আকাশ-ভূমণ্ডল-বিষয়ক ভাবনার ব্যতিব্যস্ততা প্রত্যাশা করতে পারি না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন অজুহাতের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন। সন্দেহ নেই, মানসিক ও শারীরিক উভয়দিকই অস্থিরতার সৃষ্টিতে প্রভাব রাখে। এ বিষয়ে বেশ কিছু নিরীক্ষামূলক, অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা বিদ্যমান– যা এটা প্রমাণ করে যে, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হলে মানসিক মনোযোগিতা-কেন্দ্রভূতীকরণ এবং সমস্যা-সমাধানের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই সমস্ত মনোবৈকল্যগ্রস্তগণ একেবারে নিম্নপর্যায়ের হলেও ভাবনা-চিন্তায় সক্ষম। কিন্তু যারা মনোবিকার গ্রস্থ, অপ্রকৃতিস্থ, প্রবল বুদ্ধি-বিভ্রাটে আক্রান্ত, বার্ধক্য-বিকারে পর্যুদস্ত; তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যানমগ্নতা/ চিন্তাশীলতার/ অভিচিন্তনে সক্ষম নয়। এমন কি ন্যূনতম পর্যায়েও। এজন্যই এদের কর্মকাণ্ড অধর্তব্য। সুস্থ সুষম মনের অধিকারী এবং অধর্তব্য মনোবিকার গ্রস্থের মাঝে এটাই হল পার্থক্য। সংবেদনমূলক ও মনস্তাত্ত্বিক এমন অসংখ্য স্তর রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে চিন্তার পর্যায় অনুসারে ব্যক্তি-মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

সন্দেহ নেই, একজন মুমিন-বিশ্বাসীর জন্য অঙ্গ-বৈষম্য তথা শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অসুস্থতা অনেক জটিল। বরং কোনো কোনো আল্লাহ-ভক্তলোক শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার পর আনন্দ/ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কখনো কখনো এই সমস্ত শারীরিক সমস্যাই তার জন্য চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা, জিকির-স্মরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না কোনোভাবেই। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, মানসিক অস্থিরতা ও হৃদ্দিক সঙ্কীর্ণতা মানসিক স্বচ্ছতার সম্পূর্ণ

বিরোধী, যে স্বচ্ছতা অভিচিন্তক, চিন্তামগ্ন খোদা-স্মারক ব্যক্তির একান্ত প্রয়োজন। বরং এ নীতিবাচক দিকগুলোই কখনো তাকে হতোদ্যম করে তোলে, মঙ্গলজনক কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই দেখা যায়, রাসূল (সা.) তাঁর চির পরিচিত প্রার্থনায় দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অলসতা, অবসাদ ও ক্লান্তি থেকে মুক্তি কামনা করেছেন। বরং কখনো কখনো ভীরুতা-অলসতাই, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার জনকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ) পরিবেশ-প্রতিবেশকেন্দ্রিক উপাদান

চতুর্থ উপাদান মুমিন-বিশ্বাসীর যাপিত পরিবেশের প্রভাব, তার মানসিক শূন্যতা, দৈনন্দিন সমস্যাকেন্দ্রিক ব্যস্ততা, পরিচিত জীবন-জটিলতা, পেশাকেন্দ্রিক ব্যস্ততা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত, যার কোনো সীমা-সংখ্যা নাই।

যে মুমিন-বিশ্বাসী সতী-সাধ্বী নারীর সঙ্গে জীবন-যাপন করেন, এমন শহরে যেখানে সৌখিন জীবনের সকল উপাদানই প্রাপ্তব্য, তাছাড়া সপ্তাহে অন্তত সাত ঘণ্টা পড়াশোনা করেন, যা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসির-আকিদার বিষয়েই সীমিত; তখন এই পরিবেশের বেষ্টনে সে আল্লাহর জিকির-স্মরণ, ফিকির-চিন্তন ও অবিরাম ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

কিন্তু যে মুমিন-বিশ্বাসী কোনো বিশেষ কোম্পানিতে সকাল-সন্ধ্যায় কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ পরিশ্রান্ত, তার অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় ব্যবসায়িক দাম-দর নির্ধারণে, হিশাব-নিকাশ পরিচালনায়, সরকারি দান-দক্ষিণার সন্ধানে। তারপর ঘরে ফিরে এসে নতুন করে রেস্তোরাঁর সামনে, পেট্রোল পাম্পে, ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিরাপদ করার জন্য এবং পরিবারের ক্ষোভ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সে সময়-স্বস্তি কিছুই পায় না, যাতে সে আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে ভাবনায়, জিকির-স্মরণে, ফিকির-চিন্তনে গভীরতা লাভ করতে পারে। হোক না সে ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির সমমর্যাদা-সম্পন্ন এবং মানসিক স্নায়ুবিক নির্মাণ-সজ্জায় প্রায়-সদৃশ।

ঙ) ভাবিতব্য বিষয়ে মুমিন-বিশ্বাসীর পরিচিতি-পর্যায়

পঞ্চম উপাদান নির্ভর করে যে সৃষ্টি-বিষয়ে মুমিন-বিশ্বাসী চিন্তাশীল-ধ্যানমগ্ন, তার বৈশিষ্ট্য-গুণাবলির ব্যাপারে ব্যক্তির পরিচিতির গভীরতার উপর। এজগতের চারপাশে প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও পরিচিতির পরিমাপে অসংখ্য নিদর্শন-উপদেশ খুঁজে পায়। আমরা সাধারণ চোখে আকাশের দিকে তাকাই, এর জাদুময় সৌন্দর্য-প্রশস্ততা নিয়ে ভাবিত হই, এর প্রোজ্জ্বল তারকারাজি দেখে অবাক হই। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ মুমিন-বিশ্বাসী আকাশে চোখ মেলে দৃষ্টিগ্রাহ্য-অগ্রাহ্য সবই অবলোকন করেন। ছড়িয়ে থাকা আলোকোজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে

বিলিয়ন বিলিয়ন উত্তপ্ত সূর্যের দেখা পান, যা সীমাহীন শূন্যে লাভা নিক্ষেপ করে। শূন্য প্রশস্ততায় মিলিয়ন মিলিয়ন ছায়াপথের সন্ধান পান, যা মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এগুলোকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার নানা তত্ত্বের আলোকে। এদের পারস্পরিক দূরত্ব অস্বাভাবিক দ্রুততায় বেড়ে যায়, প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ হাজার মাইলের দূরত্বে পৌঁছয়। এই সমস্ত মুমিন-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী যখনই আকাশের দিকে চোখ মেলেন, তখন তিনি অনুভব করেন যে, অলৌকিকতা অবিরাম বেড়েই চলেছে, শূন্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জগতের প্রশস্ততা হচ্ছে সীমাহীন *"আমি আকাশকে নিজ হাতে নির্মাণ করেছি, আমি এর প্রশস্ততাদাতা।"* (আল-জারিয়াত : ৪৭) তেমনি তিনি সৃষ্টি-কৌশলে, অভিনবত্বে আল্লাহর একত্ব অনুভব করতে পারেন। স্থান-কাল একান্তভাবেই অভিন্ন, পিণ্ডবদ্ধতা ও সক্ষমতা একটি সত্যের দুটি দিক মাত্র। আমরা সবাই যদি ঈমান-বিশ্বাস, মনোযোগিতা-কেন্দ্রিভূতকরণ, হৃদয়ের উপস্থিতির ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের হই, তাহলেও ঐ বিজ্ঞানী চিন্তার গভীরতায় আমাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে-পৌঁছে যাবেন।

চ) কার্যকর ক্ষমতা ও সঙ্গ-প্রভাব

বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনা– যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি– একটি উদ্যমতা মাত্র, যা মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যায়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্য ধারাবাহিকতা, আল্লাহ-সম্পৃক্তি, ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে গভীরতা এবং জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। এমনকি তিনি এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেন যে, চতুর্পার্শ্বের দৃশ্য-শ্রোত্যের মাঝে অর্থাৎ সর্বত্র আল্লাহর গুণাবলি, করুণা, কৌশল ও শক্তির বহি:প্রকাশ দেখতে পান। আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রচিত "মাদারিজ-আল-সালিকিন" আরবি গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, "আল্লাহর জিকির-স্মরণে মগ্ন, চিন্তায় ব্যস্ত মানুষের জন্য মহান দরবারে উপস্থিতির দ্বার সব সময়ের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। তিনি তাঁকে সেই আকাশের উপরেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। তিনি নিজ আরশে যথাসমাসীন। সৃষ্টিজীবের প্রতি যত্নবান, তাদের সকল কথার শ্রোতা, অদৃশ্যের দর্শক। এরপর শক্তিধরের সামীপ্যে অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। জাগতিক পরিবর্তন সবই অবলোকন করতে পারেন, আল্লাহ-কর্তৃক অস্তি-জগতের পরিবর্তনও অনুধাবন করতে সক্ষম। তখন সৃষ্টিজগতের ক্ষুদ্রতম বস্তুও সৃষ্টিকর্তার প্রতি ইঙ্গিত করে, তাঁর গুণের পূর্ণতা, মাহাত্মের উজ্জ্বলতাকেই প্রকাশ করে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে সৃষ্টি-জীব আড়াল হয়ে দাঁড়ায় না। বরং প্রতিটি সৃষ্টি আপন আপন ভাষায় তাকে আহবান করে : শোনো, আমার সাক্ষ্য সেই মহান সত্তার অনুকূলে, যিনি সকল সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমি তার সুদৃঢ় সৃষ্টির সামান্য পরিচয় মাত্র। এভাবেই তা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। তখন জগত তার অন্তর থেকে গুটিয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। থাকে শুধু মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ। হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় ভালবাসা, নিষ্ঠা, সততা, উত্তম ব্যবহার, জ্ঞানের সীমাহীন

জ্যোতি– যেভাবে সূর্যের শরীর থেকে আলোকের উদ্ভাস ঘটে থাকে।"[৬০] অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, সূর্যের জ্যোতির সঙ্গে উদাহৃত ইবনুল কাইয়ুমের জ্যোতির উৎসারণ তাদের ক্ষেত্রেই ঘটে, যারা তেমন আল্লাহভক্ত হতে পারেন, অথবা তার বন্ধুতা অর্জন করেন অথবা ছাত্রত্ববরণ করেন। রাসূল (সা.) বলেন, "মানুষ নিজ বন্ধুকর্তৃক প্রভাবিত। তাই তোমাদের প্রত্যেকেই সঙ্গীর চরিত্র যাচাই করে নাও।"[৬১] কার্যকর আদর্শ ও সঙ্গ-প্রভাবের বিষয়ে খুব বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ, ধর্ম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে, আধুনিক নিরীক্ষামূলক সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং সাধারণ মানুষজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও এর প্রতি তাগিদ প্রদান করেছে এবং তা তাদের কাছে স্বত:প্রণোদিত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। এজন্যই কার্যকর আদর্শ ও সঙ্গ-প্রভাবের উপাদানটি মুমিন-বিশ্বাসীর চিন্তা-গভীরতার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তেমনি ভুল আদর্শ এর পথকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে।

ছ) বস্তুসত্তা বা বস্তু-প্রকৃতি

সপ্তম বিষয় হল বস্তুসত্তা, বস্তু-প্রকৃতি। অর্থাৎ তা হল চিন্তার বিষয়, চিন্তন-কর্ম ও এর বৈশিষ্ট্যাবলি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষের উদ্ভাবন বিষয়ে ভাবনা, আল্লাহর সঙ্গে এর সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তার তুলনায় আল্লাহকর্তৃক সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শন যথা পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে স্বাভাবিক চিন্তায় মগ্ন হওয়া মানুষের পক্ষে খুব সহজ। কারণ প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় যা মনুষ্য-হাত-স্পৃষ্ট নয়, তা মানব উদ্ভাবিত কৃত্রিম বিষয়সমূহের তুলনায় অধিক বস্তুনিরপেক্ষতার দাবিদার। বরং প্রাকৃতিক এমন কিছু বাহ্যিক নিদর্শন আছে যা সরাসরি/ প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা, অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে। মানুষের আত্মিক ও মানসিক প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। তার হৃদয় ও চিন্তার উপর তা চেপে বসে। যেমন বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রের গর্জন, বৃষ্টির বর্ষণ, বায়ুপ্রবাহের সোঁ সোঁ ধ্বনি মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। এতে করে অনায়াসে তার মনে চিন্তার সূচনা ঘটে, যাতে ভয় ও আশার সংবেদনা তীব্রভাবে মিশে থাকে :

"তিনিই তোমাদের বিদ্যুত্যভা প্রদর্শন করান ভয়-আশার মাধ্যমে। ভারসম্পন্ন মেঘের সৃষ্টি করেন।" (আল-রা'দ : ১২)

অন্য দিকে এমন কতিপয় বাহ্যিক প্রাকৃতিক নিদর্শন বিদ্যমান, যার বিষয়ে ভাবনা ও চিন্তা অত্যন্ত জটিল। হয়ত তা বস্তু নিরপেক্ষতায় গভীরভাবে সেঁধিয়ে আছে। অথবা মানব-বুদ্ধি এর প্রকৃতির কল্পনায় এবং পরিবেষ্টনে একান্ত অক্ষম। কারণ এর কিছু কিছু অজড়, স্থান-কালের আবরণে যা অধর্তব্য। অথচ স্থান-কালের সাহায্যেই মানব-বুদ্ধি সক্রিয় হয়।

---

[60] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'মাদারিজ আল-সালিকিন', পৃ : ৬৩২।

[61] আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, তিরমিজি কর্তৃক গ্রন্থিত।

জ) বস্তুনিচয়ের সঙ্গে অভিচিন্তকের ঘনিষ্টতা

এটা কোনো অবাক ব্যাপার নয় যে, গভীর ঘনিষ্টতা এবং স্বাভাবিক অভ্যস্ততা কোনো বিষয়ের চিন্তা-ভাবনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। বৈচিত্রহীন পুনরাবৃত্তি জগৎ-সংসারের বাহ্যিক মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যকে বিলোপ করে দেয়। তা না হলে প্রতিদিন ভোরে সূর্যোদয়ে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনুভূতি আলোড়িত হচ্ছে না কেন? সকাল-সন্ধ্যায় পৃথিবী-পৃষ্ঠের গুল্ম-বৃক্ষ, জন্তু-জানোয়ার, আকাশের হরেক রকমের পাখি এবং সাগরে-নদীতে অসংখ্য মাছের মুখোমুখি হয়েও আমাদের বিনয় ও নিবেদনের ভাব জেগে উঠছেনা কেন?

অভ্যস্ততা-বাস্তবতা এবং চিন্তা-ভাবনা– এদুয়ের গূঢ়-প্রভাব বিষয়ে ইবনুল জুজি তাঁর হজ্জ ভ্রমণের আলোচনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। খায়বারের পথে বিশাল পাহাড়-দর্শনে তার এমন প্রভাব হয়েছিল, যে অনুভূতিতে গভীর ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং এর ভাবনায় মথিত হয়ে আল্লাহর মহত্ত্বে তিনি বিনীত হয়ে পড়েন। অথচ সর্বদা সাগর, আকাশ-বাতাসের বিকটতা দর্শন করেও তাঁর মনে কোনো রকমের ভীতি সঞ্চার হয় নি, যা পাহাড়-দর্শনে হয়েছে। ইবনুল জুজি নিজ বর্ণনায় তা এভাবে তুলে ধরেন :

"হজ্জের পথে আরব বিষয়ে আমার মাঝে ভীতি সঞ্চারিত হয়। খায়বারের পথ ধরে চলতে থাকি। চোখে পড়ে বিশাল পাহাড়, অবাক করা রাস্তা-পথঘাট; যা আমাকে উদাসীন করে দেয়। আমার হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার বড়ত্ব বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত রাস্তার উল্লেখে আমার মাঝে এক রকমের সমীহবোধের জন্ম হয়, অন্যান্য রাস্তার উল্লেখের সময় যা হয় না। মনকে বলি, তোমার জন্য আফসোস! তুমি সাগরে যাও, তাকে চিন্তা-ভাবনার দৃষ্টিতে অবলোক করো। এর চেয়ে বড় মহত্ত্ব দেখতে পাবে। জগতের দিকে চোখে মেলো, আকাশ এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলের তুলনায় তা যেন বিশাল প্রান্তরে একেবারে পরমাণুবৎ। আকাশ ভ্রমণে বেরোয়, ঘুরতে থাকো আরশের চারপাশে। জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন করো। এরপর সবকিছু থেকে বেরিয়ে আসো। ভালো করে দেখো। দেখবে, সব কিছুই সেই শক্তিধরের হাতে বন্দি, যার শক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এরপর তোমার নিজের দিকে চোখ ফেরাও। অনুধাবণ করো তোমার আদি, তোমার অন্ত। প্রাগাদি বিষয়ে ভাবো, শুধুই শূন্যতা। অন্তোত্তর বিষয়ে ভাবো, শুধুই মাটি। এই সৃষ্টিজগতকে যিনি সূচনা ও শেষের দৃষ্টিতে বিচার করবেন, তিনি কীভাবে এর সঙ্গে ঘনিষ্টতা তৈরি করবেন? হৃদয়বান মানুষজন সেই মহান প্রভুর স্মরণ থেকে কীভাবে বিরত থাকবেন?

শপথ আল্লাহর, মন যদি উদাসীনতা থেকে মুক্ত হতে পারত, তাহলে ভয়ে বিগলিত হয়ে যেতো। অথবা জগৎ-প্রেম বিনাশ হয়ে যেতো। কিন্তু অনুভূতি ছিল তখন প্রবল, তাই পাহাড় দর্শনে স্রষ্টার শক্তি-মাহাত্ম বেড়ে যায়। বুদ্ধি যদি জগৎ-ভাবনায়

সচেতন হয়, তাহলে পাহাড়ের চেয়েও মহত্তর কোনো শক্তির প্রমাণ তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টা থেকে উদাসীন করে রেখেছেন। তার অসীম পবিত্রতা।"[৬২]

তাই যখনই ঘনিষ্টতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, অভ্যন্তরের পর্দা ততটাই নিবিড় হয়ে পড়ে যে, আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকেও আমরা ভুলে থাকি। হয়ত অভ্যাসের এই পর্যায়ই মানুষকে পৃথিবীর বুকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাবনা থেকে বিরত রাখছে। কারণ, তুলনামূলকভাবে সেই এর সঙ্গে অধিক জড়িত। এর কারণ জগৎ-সংশ্লিষ্ট তার রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব। যুগ-পরম্পরায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক সব বিষয়েই দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয়েছে। ভূগোলশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, যানবাহন, উৎপাদন, যুদ্ধশাস্ত্র ইত্যাদি নানা শাস্ত্র, জ্ঞানকাণ্ড তারা উন্নীত করে সফল হয়েছে। কিন্তু মানব-বিজ্ঞান সেই পেছনেই পড়ে আছে। আধুনিক মানুষ মানবের জড়পাঠ ও শরীরতাত্ত্বিক গবেষণায় অতীতের ক্ষতিপূরণে সক্ষম হলেও মানবের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান তুলনামূলকভাবে অনেক পাশ্চাতে পড়ে আছে।

এই অধ্যায়ে আমরা এটা বর্ণনার চেষ্টা করেছি যে, কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মুমিন-বিশ্বাসীদের চিন্তার গভীরতায় ব্যক্তিক পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ইমানের গভীরতা, মানসিক মনোযোগিতা-কেন্দ্রভূতকরণের ক্ষমতা, মুমিন বিশ্বাসীর বৌদ্ধিক ও সংবেদনশীল অবস্থা, পরিবেশ-প্রতিবেশকেন্দ্রিক উপাদান, ভাবিতব্য বস্তুনিচয়ের সত্তা-প্রকৃতি এবং বস্তুনিচয়ের ব্যাপারে অভিচিন্তকের ঘনিষ্টতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনা মানসিক, আত্মিক ও চিন্ত াগত বিষয়েই সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু আলোচনার শেষ-প্রান্তে এসে আমরা বিভিন্ন উপাদানের তুলনামূলক গুরুত্বের বিষয়টি খোলাসা করতে চাই।

সন্দেহ নেই, উল্লিখিত উপাদানগুলোর তুলনামূলক গুরুত্বের বিষয়টি নির্ভর করে চিন্তাকর্ম নিয়ে ব্যক্তি যে পারিপার্শ্বিকতার বসবাস করে, তার উপর। যখন মুমিন-বিশ্বাসীর মানসিক ও সংবেদনশীল অবস্থা উন্নততর হয়, তখন কখনো কখনো চিন্তার গভীরতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। মুমিন-বিশ্বাসী যখন শহুরে শোরগোল থেকে ফিরে দূরের কোনো গ্রামে বাস করেন, যেখানে সৎ ও খোদা-ভীরুতার পথে তার সহায়ক-উদ্দীপক ব্যক্তির সন্ধান মেলে; তখন যদি চিন্তা-ভাবনায় অব্যাহত অনুশীলন চালিয়ে যান, তাহলে মুসলিম খোদা-ভীরুতা ও পূণ্যের পথে অধিক সহায়তা পাবেন। কিন্তু আল্লাহ তালার সৃষ্টি-বিষয়ে ভাবনায় মগ্ন মুমিন-বিশ্বাসীর চিন্তা-গভীরতার সীমানা নির্ধারণে যে উপাদানটি প্রধান ভূমিকা পালন করে, তা হল ইমান-বিশ্বাসগত উপাদান।

---

[62] ইবনুল জাওজি, 'সাইদ আল-খাতির', পৃ : ১৪৮-১৪৯।

সুতরাং ইমান-বিশ্বাসের গভীরতা ও আল্লাহ-সম্পৃক্তিই হল মূল মেরুদণ্ড। অন্যান্য উপাদান যেমন কেন্দ্রীভূতকরণ-মনোযোগিতায় মুমিনের ক্ষমতা, ভাবিতব্য বিষয়ে ব্যক্তির পরিচিতি ও জ্ঞানের স্তর ইত্যাদি উপাদানের যে আলোচনা আমরা উপস্থাপন করেছি, তা তো মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাদান; যা ঈমান-বিশ্বাসগত উপাদানকে অনুসরণ করে চলে এবং প্রভাব সৃষ্টিতে এর থেকে শক্তি-সংগ্রহ করে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের কারণে বস্তুনিচয়ের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান ও পরিচিতি আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি বিষয়ে উচ্চতর ধ্যানমগ্নতা-অভিচিন্তনের ক্ষেত্রে অন্য সকল মুমিন- এমনকি সাহাবাদের থেকেও আমরা অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন– এ কথা যারা বলেন, তারা ভুল বলেন। কারণ, মুমিন-বিশ্বাসী আপন পরিবেশ-প্রতিবেশে যা দেখেন, অনুভব করেন; তার প্রভাবক শক্তি-ক্ষমতা নির্ভর করে ঈমানে-বিশ্বাসে, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহ-প্রীতির গভীরতা ও মৌলিকতার উপর। সেই তুলনায় বস্তুনিচয়ের বাহ্যিক গবেষণায় যে পরিচিতি-জ্ঞান-তথ্য অর্জিত হয়, মজবুত হয়; তার নির্ভরতা অনেক অনেক কম। চিন্তাশীলতা একটি সংবেদনশীল অবস্থা, যেখানে মুমিন-বিশ্বাসী বিস্তৃত-প্রশস্ত বিশ্ব-জগতের সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতার অনুভবে প্রভাবান্বিত হন। চিন্তাশীলতা শীতল জ্ঞানতাত্ত্বিক কোনো বিষয় নয়, যে জ্ঞানের বৃদ্ধিতে এর পরিমাপ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে একটি অনুভবযোগ্য উদাহরণ নির্মাণ করতে পারি। যেমন আমরা মেনে নিলাম যে, আমাদের আলোচ্য উপাদানগুলো পারস্পরিক সাদৃশ্যময় অনুমানভিত্তিক এককের সমষ্টি। এগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে অভিচিন্তক, চিন্তামগ্ন মুমিন-বিশ্বাসীর অবস্থার পরিবর্তনে।

যদি ঈমান-বিশ্বাসগত উপাদানের জন্য আমরা A প্রতীক নির্ধারণ করি, মানসিক মনোযোগিতা-কেন্দ্রীভূতকরণের জন্য B, ভাবিতব্য বিষয়ে মুমিনের জ্ঞানের প্রেক্ষিতের জন্য C, বস্তুনিচয়ের বৈশিষ্ট্যভিত্তিক উপাদানের জন্য D, ইত্যাদি একে একে বিভিন্ন বর্ণে; তাহলে দেখা যাবে যে, অনুমিত সকল এককের সাহায্যে চিন্তা-গভীরতার পরিমাপ যে কোনো এককের তুলনায় ঈমান-বিশ্বাসগত উপাদান তথা A-এর উপর নির্ভর করে। যদি একে গাণিতিক সূত্রে সন্নিবেশ করি, তা হবে নিম্নরূপ:

চিন্তাগভীরতার পরিমাপ = ঈমান-বিশ্বাসগত উপাদানের পরিমাণ × (মানসিক মনোযোগিতা-কেন্দ্রীভূতকরণে পরিমাণ + বস্তুনিচয়ের জ্ঞানের পরিমাণ + সংবেদনশীল অবস্থার পরিমাণ + ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে ফলাফল দাঁড়ায় :

চিন্তা গভীরতা পরিমাপ = A×B + C + D + E... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই অনুমিত সমীকরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ঈমান-বিশ্বাসগত উপাদানের প্রভাবে অন্য সকল উপাদানের যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে, তা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অপরাপর উপাদানের প্রভাব প্রতিপত্তি ঈমান-বিশ্বাসগত উপাদানের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ সে হল যোগকরণ ও পূরণকরনের পার্থক্য। এ জন্য

যিনি সাহাবার ইমান-বিশ্বাস ধারণ করেন, তার পরিবেশ-প্রতিবেশ-সম্পর্কিত সামান্য জ্ঞান এবং সামান্য সময়ই যথেষ্ট। এর মাধ্যমেই সে গভীরতর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, যেখানে আমাদের মত দুর্বলদের অনুপ্রবেশ অকল্পনীয়। অন্যদিকে ভাবিতব্য বিষয়ে যার অগাধ জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, তার সময় ও মানসিক স্বস্তিও পর্যাপ্ত; কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুর্বল; আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে চিন্তা-গভীরতার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু যদি ঈমানি-বিশ্বাসগত উপাদান হ্রাস পায়, এমনকি শূন্যতার পর্যায়ে তথা সুস্পষ্ট কুফরি-অবিশ্বাসের স্তরে নেমে যায়; তাহলে অপরাপর উপাদান মূল্যহীন হয়ে পড়ে– এর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন। কারণ শূন্যের সঙ্গে গুণ করে শূন্য ছাড়া কিছু অর্জিত হয় না।

চিন্তা-ভাবনা, ঈমান-বিশ্বাস ইত্যাদির বিষয় হল আত্মসংশ্লিষ্ট, যা এমনতর সরল সমীকরণ ও অনুমানের বশ্যতা স্বীকার করে না। সে তো এক নিরেট কল্পনা, যা আমার মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়েছে। পাঠককে এর অংশভাগ দেওয়ার জন্য তা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

আমার প্রত্যাশা, এই মহান ইবাদত-উপাসনায় অধিক গুরুত্বদানে, পুনর্বার দৃষ্টিদানে আগ্রহী পাঠক এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। তিনি তার হৃদয়ে প্রবাহিত উপদানসহ নানা উপাদানের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবেন, যেন অর্জিত প্রণোদনাশক্তি নিয়ে চিন্তার গভীরতায়, আত্মিক ও মানসিক প্রকৃতিতে চিন্তার ইবাদত-উপাসনাকে দৃঢ়করণের জন্য সচেষ্ট হতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব উপাদান-অভ্যাস সম্পর্কেও পরিচয় অর্জন করবেন, যা তাকে চিন্তার পথে বাধাগ্রস্থ করে। যেন সে এর থেকে বিরত থাকতে পারে, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

আমরা আমাদের সাধ্যমত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করলাম, যা মুমিন-বিশ্বাসীদের ব্যক্তিক ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে প্রত্যেক মুমিনের নিজস্ব কিছু পার্শ্বিকতা থাকে। একক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থাকে, যা তার একান্তই নিজের।

জাগতিক নিয়মে অভিচিন্তন পরিপ্রেক্ষিত ধর্ম ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান

আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে অভিচিন্তন-ধ্যানমগ্নতা ইসলামে উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন ইবাদত-উপাসনা হিসাবে গণ্য। তাই জগত-ব্যবস্থার সম্মুখভাগে সকাল-সন্ধ্যা উপস্থাপিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহ থেকে যার যুক্তি, বুদ্ধি, দৃষ্টি, শ্রুতি, হৃদয় ও মুখ ফিরিয়ে থাকে, সে নির্ঘাত অভাগা, কপালপোড়া।

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে একটি একটি করে নিদর্শন বিদ্যমান। তারা একে অতিক্রম করে ঠিকই, কিন্তু তারা বিমুখ।" (ইউসুফ : ১০৫)

বরং এই সমস্ত উদাসীনদের কেউ কেউ জড়পদার্থের শক্তিতে এবং জীববিদ্যায় লুক্কায়িত আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের ব্যাপারে অবহিত, কিন্তু ভাসা ভাসা জ্ঞানের এ পর্যায় থেকে তারা উর্ধ্বে উঠতে চায় না। তাই সৃষ্টি জগতের অপরূপতা থেকে এর স্রষ্টা ও নিয়ন্তার দিকে পৌঁছাতে পারে না।

"তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিকতাই জানে। পরকালের ব্যাপারে তারা উদাসীন।" (আল-রুম : ৭)

আদতে জাগতিক দৃশ্যময়তা থেকে অতিক্রম করে স্রষ্টা সমীপে উপস্থিতিই মুসলিম ও অমুসলিমের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-জগতের মাঝে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলে। কারণ ইবাদত-উপাসনা হিসাবে অভিচিন্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপই হল অথবা নিদেনপক্ষে মানুষের বাহ্যিক পরিবেশে অভিচিন্তন মানেই হল সচেতন পর্যবেক্ষণ–পঞ্চেন্দ্রিয় তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে সূক্ষ্ম পরিদর্শন, প্রত্যক্ষণ। ঠিক নির্দিষ্ট এই মৌলিক পদক্ষেপই নির্ভরযোগ্য ফললাভে, সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। তেমনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের একক ও অভিন্ন দলিল-প্রমাণ। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সূচনা ঘটে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও পঞ্চেন্দ্রিয়কেন্দ্রিক ভাবনার পথে। এরপর সাধারণীকরণ, অনুমানকরণ ও প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হয়, যেন পুনর্বার সব প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমানের বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানী Whilehead[৬৩] এখানেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিমানের সঙ্গে তুলনা করেন, যাকে শক্ত পর্যবেক্ষণের মাটি থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। যেন সে সাধারণীকরণ ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আকাশে উড়তে পারে। এরপর তা দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয় ভাবনার ভূমিতে অবতরণ করে।

---

[63] As quoted by L. Malpass, Human Behavior, McGraw Hill, 1966, পৃ : ৩।

সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, জাগতিক বিষয়ে মুসলিমের চিন্তন-ক্রিয়া এবং আধুনিক অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানীর গবেষণা বাহ্যিকভাবে হলেও সাদৃশ্যময়। উভয় পদ্ধতিতেই সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন বস্তুনিচয়ের কোনো অনুসন্ধান করা হয় না। বরং আকাশ এবং ভূমির সৃষ্টিতে সাধারণভাবে পরিচিত নিয়ম-কানুন, প্রথা-পদ্ধতির তথ্য-তালাশ করা হয়।

কারণ ঈমান-বিশ্বাস, কুফরি-অবিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি না দিয়েও মানুষ হিসাবে প্রত্যেক প্রকৃতিই নৈরাজ্য ও রহস্যকে এড়িয়ে চলে। সকাল-সন্ধ্যায় উদ্ভাসিত উদ্দীপক শৃঙ্খলা ও স্পষ্টতার প্রতি আকৃষ্ট। এমন কি গবেষণাগারে সরল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে যখন কোনো অসম্পূর্ণ বা রহস্যপূর্ণ আকৃতি দেখতে পায়, তখন সরাসরি সে শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে।[৬৪] যেন আকৃতিটা বৃত্ত, ত্রিভূজ বা অন্য কোনো প্রতীকে– যেমন একটি ব্যাসের জ্ঞান অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো সংস্থার লোগো হিসাবে পরিণত হয়।

বাহ্যিকতার দেখা মেলে মানব-অনুভূতি ও অভিচিন্তনে, যা পঞ্চেন্দ্রিয় তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বকের সাহায্যে অর্জিত হয়। তেমনি কোনো ভাব-নির্মাণে, বস্তুনিরপেক্ষকরণে এবং সমস্যার সমাধানে উচ্চতর বৌদ্ধিক সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করি। এজন্যই মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার বিস্তৃত জগতে চোখ মেলে তাকায়, স্বাভাবিকভাবেই সেই সব নিয়ম-রীতি অনুসন্ধান করেন, যা দৃশ্যত বিভিন্নতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। যেন এই শৃঙ্খলার আবরণে এর নশ্বতার জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং রহস্য অপসারিত হয়।

মুমিন-বিশ্বাসীর হৃদয়কে যা অধিক আলোড়িত করে, তা হল : আল্লাহ তায়ালার নির্মাণের সূক্ষ্মতায় সংগুপ্ত ঐশ্বরিক রীতি-পদ্ধতি রহস্য উদঘাটন করা। হোক তা ছোট্ট একটি পিঁপড়ার জন্য রাসায়নিক পরিভাষার আবিষ্কারে বা বিশাল আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরিচয়ে।

হতে পারে, এই যে স্বভাব-প্রকৃতি, মানুষের হৃদয়-মূল– যা আল্লাহ তায়ালা গচ্ছিত রেখেছেন– তাই আধুনিক চিন্তামগ্ন বিজ্ঞানীদেরকে আল্লাহ-ভক্ত মানুষদের ভাষায় কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই দেখতে পাই আমেরিকার এক বিশেষ বিজ্ঞানী পরজৈবিক বিদ্যার অধ্যাপক ড. সিসিল হামান, বাবুই পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন :

"বাবুই পাখির বাসা সম্পর্কে কী বলা যায়? এই পাখিকে এমন উচ্চতর শিল্প কে শিখিয়েছেন? বাবুই কর্তৃক নির্মিত এই প্রকারের বাসাগুলো পারস্পরিক সাদৃশ্যময় কেন? যদি বলা হয় যে, জন্মগত গুণের কারণেই এমনটি ঘটে। এটা একটা অসম্পূর্ণ জবাব। কারণ তাহলে এর থেকেও একটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে। আর তা হল, জন্মগত ও

---

[64] মানুষের বাহ্যিকতাকে স্পষ্ট করার জন্য Gestald (সামগ্রিকতাবাদ) মতবাদে বিশ্বাসীদের কতিপয় নিরীক্ষার দিকে ফিরে দেখা যেতে পারে।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ কী? কেউ কেউ বলেন তা হল আচরণিক বিদ্যা যা কোনো প্রাণীকেই শিখতে হয় না। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, সৃষ্টি জগতের সর্বত্র আল্লাহ তায়ালার শক্তি-ক্ষমতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আল্লাহ এদের সৃষ্টি করেছেন এবং বিশেষ নিয়ম-রীতি অনুসারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। যার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা একান্ত অনবহিত।"[৬৫]

অন্যদিকে ইসলামের প্রাথমিক প্রজন্মের আল্লাহ-ভীরু মানুষদের এবং তাদের অনুসারী উচ্চপর্যায়ের আলেমদের চিন্তা-চেতনা পাঠ করলেও এ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা যায়। কখনো কখনো তাদের সূক্ষ্ম-দর্শিতা কিছু কিছু আধুনিক জ্ঞানের তুলনায় অনেক প্রখর এবং নিখুঁত, যা আমাদের অবাক করে দেয়। ড. সিসিল হামান যে পাখির বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক ইমাম গাজ্জালিও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পড়লে মনে হয়, তিনি একজন আধুনিক বিজ্ঞানী। তার মূল্যবান গ্রন্থ "আল-হিকমাহ ফি মাখলুকাতুল্লাহ"–তে তিনি বলেন :

"জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন– আল্লাহ তায়ালা পাখি সৃষ্টি করেছেন। তাকে এমন কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে সে অনায়াসে উড়তে পারে। উড্ডয়ন-প্রতিবন্ধক কিছুই তার মাঝে সৃষ্টি করেন নি। হাত নয়, পাখির জন্য সৃষ্টি করেছেন দুটি পা। তার জঙ্ঘার চামড়া অনেক মজবুত, পুরো। কারণ জল ও কাদাপূর্ণ স্থানেও তাকে নামতে হয়। যদি জঙ্ঘায় পাখার আবরণ দেওয়া হত, তাহলে সিক্ত ও কর্দমাক্ত হাওয়ার দরুণ তার সমস্যা হতো। উড়ায় বাধাগ্রস্থ হতো। অর্ধবৃত্তের মতো করে তার বক্ষকে ভাঁজ করে সৃষ্টি করেছেন। যেন বিনাকষ্টে বায়ু পার হতে পারে। তেমনি তার পাখার অগ্রভাগ বৃত্তাকৃতির, যা তাকে উড্ডয়নে সহায়তা করে। পালক-মূলকে তিনি দৃঢ় করেছেন। সুবিন্যস্তভাবে তা স্থাপন করেছেন, যা তার ডানার শক্ত চামড়ার উপযোগী। তিনি পালককে করেছেন উষ্ণতা ও শীতলতা-নিবারক। ডানায় তিনি দৃঢ়তর পালক গুঁজে দিয়েছেন, সুষমভাবে তা স্থাপন করেছেন; প্রয়োজনাধিক্যের কথা বিবেচনা করেই। শরীরের অন্য স্থানে তিনি ভিন্ন রকম পালক পরিয়েছেন আবরণ-নিবারণ ও সৌন্দর্য হিসাবে। এরপর ভাবুন, পাখির পালকও কাপড়ের বয়নের মতোই সূক্ষ্ম সুতোয় নির্মিত। তা একান্ত শুষ্ক, যা পরিপার্শ্বকে সংরক্ষণ করে এবং তা অত্যন্ত কোমল, যাতে এর কাণ্ড ভেঙে যাবার নয়। পালক-কাণ্ডগুলো অভ্যন্তরশূন্য, যেন পাখি সহজভাবে উড়তে পারে। এর পালকের মাঝে এমন কৌশল গচ্ছিত রেখেছেন, যাতে পানিতে তা নষ্ট না হয় এবং ধুলোবালিতে মলিন না হয়। যদি কখনো তাতে পানির স্পর্শ লাগে, তাহলে সামান্য ঝাড়াতেই সকল সিক্ততা নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন তা আগের মতোই ভারশূন্য হয়ে পড়ে। প্রজননের জন্য এবং মলত্যাগের জন্য একটি

---

[65] মাওনিসমা, 'আল্লাহ ইয়াতাজাল্লা ফি আসর আল-ইলম', ফ্রাঙ্কলিন প্রকাশনী, কায়রো, ১৯৫৮, পৃ : ১৪০।

পথই নির্ধারিত করেছেন, যেন তার ভারশূন্যতা বজায় থাকে। পাখির সৃষ্টি-কৌশল ডিম-দানের সহায়ক, বাচ্চাদান নয়। কারণ তা উড্ডয়নে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

তার পুচ্ছকে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তা উড্ডয়নে সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। যদি তা না থাকতো, তাহলে উড়ার সময়ে তার ডানা ডানে-বামে বেঁকে যেতে পারে। তা যেন নৌকার হালের মতো, যার সাহায্যে তার গতিপথ সোজা থাকে।"[৬৬]

ভেবে দেখুন, পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব ও তার উড্ডয়ন-মাধ্যমের ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালির সূক্ষ্ম অভিচিন্তন। তিনি যখন কথা বলেছেন, মনে হয় পাখির আধুনিক গতিবিদ্যার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

এখন পাঠ করুন ড. মুস্তাফা মাহমুদ কর্তৃক লিখিত পিঁপড়া সম্পর্কে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সার-নির্যাস। তিনি বলেন:

"ক্ষুদ্র একটি পিঁপড়ার সম্মুখে সামান্য সময় দাঁড়ালে হতভম্বতার সৃষ্টি করে। এই পিঁপড়ে বারান্দা, সুড়ঙ্গ, শয্যাকক্ষ ও গোলাঘর সমৃদ্ধ গূঢ় জ্যামিতিক ঘর নির্মাণের পদ্ধতি কীভাবে রপ্ত করল?

একটি সমাজের নিগড়ে কীভাবে আবদ্ধ হল, যেখানে পেশা ও বৈশিষ্ট্যের অনুসারে সূক্ষ্ম বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। অন্য কীট পতঙ্গ যেমন- খাদ্য-কীটকে টেনে নেওয়া ও এদের দলবলের সামনেও তাকে টেনে- হেঁচড়ে নেওয়ার জ্ঞান সে কীভাবে পেল?

অসংখ্য পিঁপড়ে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এর অর্থ হল, এরা পরস্পরে ভাব-আদান-প্রদানে এবং ভাষা আবিষ্কারে সার্থক।" গবেষণার শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেন যে, "পিঁপড়ে পরস্পরে ভাব আদান-প্রদান করে সংকেতে বা উচ্চারিত ভাষার মাধ্যমে নয়। বরং রাসায়নিক ভাষায়। একটি পিঁপড়ের ঘর লক্ষ করুন, দেখবেন সময়ে সময়ে দুটি পিঁপড়ে মিলিত হয়, তারা চুমো ও ফিসফিসানির মতো কী যেন বিনিময় করে। বাস্তবে তা চুমোও নয়, কানাকানিও নয়। বরং প্রত্যেক পিঁপড়ে অন্য পিঁপড়ের মুখে বিশেষ লালা তুলে দেয়, যাতে সুনির্দিষ্ট অর্থের রাসায়নিক প্রতীক বিদ্যমান। অর্থাৎ 'আমরা এই-সেই করব।'

পিঁপড়ের মাঝে অন্য একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, যাকে বুদ্ধি না বলে অন্তর্দৃষ্টি বা পর্যবেক্ষণ বলাই ভালো। যেমন পিঁপড়ে খাদ্য, দানা, ক্ষুদ্রাংশ ও অবশিষ্টাংশের সঞ্চয়ে উদ্যোগী হয়। এরপর এর প্রহরার জন্য রাত্রি জাগরণসহ হামলাকরীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করে। আসন্ন শীতের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। তার

---

[৬৬] আবু হামিদ আল-গাজালি, 'আল-হিকমাহ ফি মাখলুকাতিল্লাহ', পৃ: ৮৭-৯৫।

কাছে বৌদ্ধিক ক্ষমতা নেই; তেমনি প্রয়োজনীয়তা, অবস্থা ও ভবিষ্যতের কল্পনার ক্ষমতাও তো নেই।"[৬৭]

প্রথম যুগের আলেম-ওলামা ও তাদের প্রাথমিক অনুসারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে ভাবনায় মগ্ন, তাদের ভাবনাগুলোকে আজকের সঙ্গে তুলনা করুন। তাহলে দেখবেন, তাদের গবেষণায় আধুনিক বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ বিদ্যমান। হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি পিঁপড়ে সম্পর্কে সুচিন্তিত রায় পেশ করেছেন। তিনি বলেন :

"ক্ষুদ্রাকৃতির পিঁপড়ের প্রতি লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করুন কোমল গঠনের দিকে। দৃষ্টির সাহায্যে তাকে পাবার নয়, চিন্তার মাধ্যমেও তাকে স্পর্শ করার নয়। কীভাবে ভূমিতে গুটি গুটি পায়ে চলে। খাদ্যের উপর ঝুঁকে পড়ে। খাদ্যদানা স্থানান্তর করে নিজ সুড়ঙ্গে, যথাস্থানে তা রেখে দেয়। শীতকালের জন্য গ্রীষ্মকালে তা সঞ্চয় করে। বাইরে যাওয়ার পূর্বেই ফেরার পথ নির্ণয় করে। মহাবিচারক আল্লাহ তায়ালাও তাকে বঞ্চিত করেন না। হোক না সে শুষ্ক-স্বচ্ছতায়, কঠিন পাথরে। যদি ভেবে দেখেন, উর্ধ্বে-নিম্নে এর খাদ্য সঞ্চালনে-প্রবাহে, তার অভ্যন্তরের পেটের স্তরে, মাথার চক্ষু ও কানে; তাহলে এর সৃষ্টি-কৌশলে বিস্ময়-বোধে মথিত হবেন। এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণে ক্লান্ত হবেন। সেই আল্লাহ মহান, যিনি এগুলোকে স্বভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। উপযুক্ত খুঁটির নির্মাণ করেছেন। তার এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো স্রষ্টার অংশিদারী নেই, এর সৃষ্টিতে কোনো শক্তিধর তাকে সাহায্য করে নি। যদি আপনি চিন্তার পথে এগিয়ে যান, তাহলে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌছুতে পারবেন। এটাই প্রমাণিত হবে যে, পিঁপড়ের স্রষ্টা যিনি, তিনিই খর্জুর বৃক্ষের স্রষ্টা। সকল বিষয়ের বিস্তৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জীবের বিভিন্নতা খুব রহস্যময়। বৃহৎ-কোমল, ভারযুক্ত-ভারমুক্ত শক্তিধর-দুর্বল– তার সৃষ্টিতে সবাই সমান। নির্মাতাহীন ভবন হয় না, পাপী ছাড়া পাপ হয় না। ইচ্ছে হলে বলতে পারেন যে, তিনি ফড়িং, পঙ্গপালের জন্য দুটি রক্তবর্ণ চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। তার নয়নতারাকে করেছেন চন্দ্রোজ্জ্বল। তাকে দিয়েছেন গোপন কর্ণ, সুষম মুখ, শক্তিশালী অনুভূতি, কর্তন-সক্ষম দুটি দাঁত, আঁকড়ে ধরার দুটি কাস্তেসম হস্ত। এর মাধ্যমে সে কৃষককে ফসল সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত করে দেয়। কৃষকগণ সম্মিলিত ভাবেও এর প্রতিরোধের শক্তি রাখে না। খামখেয়ালি করে সে ফসলে পতিত হয়, এর থেকে তার প্রবৃত্তির প্রশমন ঘটে। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে কোথাও আঙুল পরিমাণ খুঁত নেই।"[৬৮]

ইবনুল কাইয়ুমও পিঁপড়ে বিষয়ে ভাবিত। যখন লিখছেন, যেন পিঁপড়েকে সম্বোধন করার ভাষা-আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন:

---

[67] মোস্তফা মাহমুদ, 'লুগ্‌জ আল-হায়াহ', দার আল-নাহদা আল-আরাবিয়া, পৃ : ৪৭-৪৯।

[68] আলি বিন আবু তালিব রচিত 'নাহ্‌জ আল-বালাগাহ', ব্যাখ্যা: শাইখ মুহাম্মদ আবদুহু, দার আল-হুদা আল-ওয়াতনিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ১১৬-১১৮।

"দুর্বল পিঁপড়ের কথা ভাবুন। তার বুদ্ধিমত্তা, খাদ্য সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও নিরাপদে রাখার কৌশল দেখুন। এতে অসংখ্য নিদর্শন ও উপদেশ খুঁজে পাবেন। দেখবেন, পিঁপড়ের দল যখন খাদ্য সংগ্রহে বের হয়, তা স্থানান্তর করতে শুরু করে; তারা দুটি দলে বিভাজিত হয়। একটি দল বহনকারী, গমনের পথেই তা বহন করে। অন্যদল বর্হিগামী। কিন্তু দুটি দল পথে বিশৃঙ্খল না হয়ে দুটি সুতোর মতো চলতে থাকে। কোনো বস্তু যদি ভারযুক্ত হয়, তাহলে সকল পিঁপড়ে একসঙ্গে তা বহন করে টেনে নেয়। তাদের বুদ্ধিমত্তা এতোটাই বিস্ময়কর যে, কোনো খাদ্য স্থানান্তর করার পর তা টুকরো টুকরো করে ফেলে, যেন বীজ অঙ্কুরিত না হয়। যদি বিভাজিত দানা অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে চার ভাগে খণ্ডিত করে। যদি কখনো তা সিক্ত হয়, এবং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে; তাহলে তা সূর্যের আলোতে টেনে আনে। পরে অবশ্য তা সুড়ঙ্গে নিয়ে যায়। এ জন্যই কখনো কখনো বাসস্থানের দরোজায় চূর্ণ-বিচূর্ণ দানা দেখতে পাবেন, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে একটি টুকরোও আর দেখতে পাবেন না।"[৬৯]

এরপর ইমাম ইবনুল কাইয়ুম পিঁপড়ের আলোচনায় এক বুজুর্গের চমৎকার একটি কাহিনী বর্ণনা করেন, যিনি পিঁপড়ের কর্ম-প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এক সময় তিনি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেন, যা সেই দূর অতীতে এটা আবিষ্কারে সক্ষম হয় যে, পিঁপড়ের জন্য পারস্পরিক সম্বোধনের একটি ভাষা বিদ্যমান। তেমনি ভুল সংবাদ তথ্যের ভিত্তি যে পিঁপড়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করবে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি-পদ্ধতি। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম বলেন:

"কোনো এক আল্লাহ-ভক্ত নিজ চোখে-দেখা ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি বলেন, 'দেখি একটি পিঁপড়ে ফড়িংয়ের একটি খণ্ডের কাছে আসে, এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে তা বহনে অক্ষম। অদূরে কোথাও চলে যায়। ফিরে আসে এক দঙ্গল পিঁপড়ে নিয়ে।' তিনি বলেন, 'আমি তখন ফড়িংয়ের খণ্ডটি মাটি থেকে হাতে তুলে নিই।' (অর্থাৎ সেই আল্লাহ-ভক্ত লোকটি মাটি থেকে ফড়িংয়ের খণ্ডটি তুলে নেন। ফড়িং-খণ্ডটি বহন করার মত পিঁপড়ে নিয়ে হাজির হওয়ার পূর্বেই।)

'যখন পিঁপড়ে দলবলসহ সেই স্থানে উপস্থিত হয়, ঐ স্থানে ঘুরতে থাকে। দলটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে। যখন কিছুই খুঁজে পায়না, তারা ফিরে যায়। তখন আমি তা রেখে দিই।' (অর্থাৎ ফড়িং-খণ্ডটি আবারও মাটিতে রেখে দেন।) 'আবার সেই পিঁপড়েটি আসে। এর মুখোমুখি হয়েই এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু উত্তোলন করতে না পেরে অদূরে কোথাও চলে যায়। আবারও সেই দঙ্গল বাহিনী নিয়ে আসে। আমি তখনও তা প্রত্যাহার করে নিই। সকল পিঁপড়ে ঐ স্থানে ঘুরতে থাকে। কিছু না পেয়ে তারা বৃত্তাবদ্ধ হয়। সংবাদবাহী পিঁপড়েটি তারা ঘিরে ধরে। এরপর সবাই

---

[৬৯] ইবনু কাইয়ুম আল-জাউজিয়া, 'মিফতাহ দার আল-সায়াদাহ', পূর্বোক্ত, পৃ : ২৪২, ২৪৩।

আক্রমণ করতে থাকে। এর একটি একটি করে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আমার চোখের সামনেই।'"[৭০]

এরপর জামাখশারি র. এর দিকে দেখুন। তিনি তার তাফসির-গ্রন্থে খুব সূক্ষ্মভাবে পতঙ্গ-জগতের যে বর্ণনা দেন, তা খালি চোখে দেখতে পাবার কথা নয়। অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, তার খবরও তিনি আমাদের দেন। তিনি এর সমাপ্তি টানেন নিবিষ্ট প্রার্থনা ও ক্ষমা-প্রার্থনার মাধ্যমে। এতে গভীর চিন্তাশীলতার ছাপ বিদ্যমান। তিনি বলেন :

"পুরনো গ্রন্থটির ভাঁজে ভাঁজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর দেখা পাবেন; বিচরণ ব্যতীত তা ভালোভাবে চক্ষুগোচর হয় না। যদি সে চুপচাপ, আলোড়নহীন থাকে; তাই তার জন্য আবরণ হয়ে দাঁড়ায়। একে যদি হাত দিয়ে সংকেত করেন, তাহলে সে পথ পরিবর্তন করে; ক্ষতিকর অবস্থান এড়িয়ে যায়। পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি ক্ষুদ্রাকৃতি অনুভব করেন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গাদির সৃষ্টির বিস্তৃতিকে ধারণ করেন। একে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন এবং এর হৃদয়ে আলো দিয়েছেন। তবে তার সৃষ্টি জগতে এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর প্রাণীর অস্তিত্বও বিদ্যমান। পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি একই বস্তু থেকে সব কিছুকে জোড় করে সৃষ্টি করেছেন; যা ভূমির উৎপাদনে সহায়তা করে অথচ তারা তা বুঝতে পারে না। কোনো এক ব্যক্তির জন্য কয়েকটি পদ রচনা করি। যার অর্থ নিম্নরূপ :

"হে মহান সত্তা, যিনি নিকষ-কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে সামান্য মশার পাখা-সম্প্রসারণ দেখতে পান। যিনি বুকের উপরিভাগেই হৃৎপিণ্ডের শিরাগুলো প্রত্যক্ষ করেন। কৃশ হাড়ের অভ্যন্তরের শাঁস দেখতে পান। ক্ষমা করো সেই বান্দাকে, তার সকল অপরাধ– যা প্রথম জীবনে সংঘটিত হয়েছে।"[৭১]

এই পথ সমস্ত আলেমগণ নিজ দৃষ্টি শুধু বাহ্যিক সৃষ্টি-জগতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তারা এ পথ অতিক্রম করে বস্তুনিরপেক্ষ বিষয়ের দিকে এগিয়ে গেছেন। এমন কি তারা নিজের ভাবনায়ও ভাবিত হয়েছেন। যেমন আমরা পূর্বে এর কিছু সংকেত দিয়েছি। এখানে ইমাম গাজ্জালি র. বুদ্ধির প্রকাশ-বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং এতে আল্লাহ-তায়ালার যে শক্তিমত্তা গচ্ছিত রেখেছেন, তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

"বুদ্ধি চক্ষুগ্রাহ্য নয়, নয় তা কর্ণগ্রাহ্য, স্পর্শযোগ্য, নাসিকাগ্রাহ্য, জিহবাগ্রাহ্য। এর কোনো আকৃতি অনুভবযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও এ হল নির্দেশক, বশ্য, বর্ধনপ্রত্যাশী, ভাবুক, অদৃশ্যের দর্শক, বস্তুবিষয়ের কল্পনাকারী, দৃষ্টির অগ্রাহ্য বিষয়েও

---

[70] পূর্বোক্ত।

[71] আল-জামাখশারি, তাফসির আল-কাশ্‌শাফ, 'আল-মাকতাবা আল-তিজারিয়া আল-কুবরা', কায়রো, ১৩৫৪ হিজরি, প্রথম খণ্ড, পৃ : ৫৭।

তার অবাধ বিচরণ, চেতনার ক্ষমতা যেখানে সীমিত– সেখানেও তার ক্ষমতা বিদ্যমান; আকাশ-তদোর্ধ্ব বিষয়, ভূমি ও তার অন্তর্গত বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার যে পর্দাগুলো অদৃশ্যতার সৃষ্টি করেছে, তাতে পূর্ণ আস্থাবান। অর্থাৎ তা যেন চর্মচক্ষুর তুলনায় অধিক স্পষ্টতরভাবে দেখতে সক্ষম।

এটাই হল কৌশলস্থল, জ্ঞানের খনি। জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, তার শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে চলার নির্দেশ দেয়। ইচ্ছাপূর্বক নড়া বা শক্তিপ্রভাবে নড়া– কোনটি সর্বাগ্রে, তা নির্ণয়ে অপারগ। যদিও ইচ্ছার প্রকাশই আগে হয়ে থাকে।"[৭২]

ইমাম গাজ্জালি র. বুদ্ধিকেন্দ্রিক নেয়ামত-অনুগ্রহের অভিচিন্তনেই সীমিত থাকেন নি। বুদ্ধিহীনতার নেয়ামত তথা অনুগ্রহের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করেছেন। আর তা সদ্য-ভূমিষ্ট শিশুর প্রতি লক্ষ্য রেখে। খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের বৌদ্ধিক-বর্ধনের আলোচনা পেশ করেছেন, তিনি যেন একজন প্রবর্ধক মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন:

"দেখুন এবং ভাবুন শিশুর সৃষ্টি-রহস্য। বুদ্ধিহীন, সমঝহীন, নিরক্ষর অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়। কারণ সে যদি বুদ্ধিসম্পন্ন, সমঝদার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে পৃথিবীতে আগমনের পথেই অস্বীকার করে বসবে। যখন অপরিচিত বিষয়ের মুখোমুখি হবে, অদেখা বিষয়ের আগমন ঘটবে, অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হবে; তখন সে দিশেহারা ও বুদ্ধিহারা হয়ে যাবে। এরপর সে যখন নিজেকে নেকড়া মোড়ানো অবস্থায় বাহিত ও রক্ষিত দেখবে, তখন একে কলঙ্ক মনে হতে পারে; এমনকি দোলনায় আচ্ছাদিত দেখলেও। যদিও শারীরিক কোমলতার নিরিখে তা তার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া নির্বাচনে, বুদ্ধির ব্যবহারে তার অক্ষমতার জন্যই অপরাপর সবার হৃদয়ে কোমলতা, প্রেম, ভালবাসা জন্ম নেয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ক্রমান্বয়ে বুদ্ধি এবং সমঝের বৃদ্ধিই অধিক কল্যাণকর। দেখুন, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে অপার কৌশলে, বিশুদ্ধ পথে তার সৃষ্টিকে সুষম করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৭৩]

আমাদের আলেমগণ, আল্লাহ-ভক্ত মানুষজনের এই ক'টি সামান্য উদাহরণ, যেখানে সৃষ্টি জগতে আল্লাহর রীতি-পদ্ধতির আবিষ্কার, বস্তুনিচয়ের গভীরকে তলিয়ে দেখার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা, শক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। জগতের নিয়ম-কানুন-বিষয়ক গবেষণায়, যে নিয়ম-কানুন জগতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে; তাতে আধুনিক গবেষকের সঙ্গে অভিচিন্তক/ চিন্তামগ্ন আবেদ-উপাসকও সমান অংশিদার। যদিও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ আধুনিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকাণ্ড জগৎ-শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন বিষয়ে যে গবেষণা করে, নিবিড় সূক্ষ্মতায় জাগতিক

---

[72] আবু হামিদ আল-গাজ্জালি, 'আল-হিকমাহ ফি মাখলুকাতিল্লাহ', পৃ : ৮৩।

[73] পূর্বোক্ত, ৬৮।

ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে যে পূর্বাভাস প্রদান করে; তাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ– যা প্রকৃতি-সত্তার প্রতিষ্ঠিতকরণে কুরআন-কর্তৃক ব্যবহৃত। এই জগতের একজন স্রষ্টা, সংরক্ষক প্রভু বিদ্যমান। এই সূত্রেই ওহি বা প্রত্যাদেশ মানব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রোথিত স্বভাব-প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলে। আর তাই হল জগত-বিন্যাসক নিয়ম-রীতির গবেষণা :

"আল্লাহ তায়ালা বীজ ও দানার বিদীর্ণকারী। তিনি জীবন থেকে মৃত্যু নির্গত করেন, জীবন থেকে মৃত্যের নির্গমনকারী। এসত্ত্বেও তোমরা কীভাবে মিথ্যায়ন করবে? উষার বিদীর্ণকারী, রাতকে তিনি স্বস্তি, চন্দ্র-সূর্যকে গণনা-মাধ্যম করেছেন। এটা শক্তিধর জ্ঞানীর পরিমাণকরণ।" (আল-আনআম : ৯৫-৯৬)

"সূর্য নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে, প্রদক্ষিণ করে। এটা শক্তিধর জ্ঞানী প্রভুর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্য কতিপয় গন্তব্য নির্ধারণ করেছি। যেন প্রাচীন খেজুর-কাদির মতো ফিরে আসে। সূর্য কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না চন্দ্রকে। রাত অতিক্রম করবে না দিনকে। প্রত্যেকেই নিজ গতিপথে পরিভ্রমণরত।" (ইয়াসিন : ৩৭-৪০)

জাগতিক নিয়মের বাহ্যিক শৃঙ্খলা এবং এর সূক্ষ্ম বিন্যাসের গভীরতা অনুধাবন– উভয়ই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তিক স্তম্ভ। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কোনো সৌধ এ দুটি ব্যতীত নির্মিত হতে পারে না।

কারণ মুসলিম গবেষক যদি নিষ্ঠাবান হন, তাহলে অমুসলিম গবেষক পাঠ-গবেষণায় যে চালিকাশক্তির দ্বারা চালিত হয়, গবেষণার জন্য যে ভাতা পায়; সে তুলনায় তিনি অনেক উন্নতর অবস্থার যোগ্য। উভয়েই জড় প্রতিদান ও খ্যাতি অর্জন করেন। উভয়েই গবেষণায় সমস্যার সমাধানে বিনোদন লাভ করেন, সূক্ষ্ম বেশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির অনুসরণে সাধ অনুভব করেন– যা উদ্দীপক শখে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলিম গবেষক জড়-বাহ্যিকতায় অথবা শারীরিক (Biological) অথবা মনোস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক বাহ্যিকতায় সুক্ষ্ম সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। তিনি এর পেছনে আল্লাহর সৃষ্টি-কৌশল ও নিয়ম-রীতির সন্ধান লাভ করেন। প্রকারান্তরে তিনি যেন উচ্চতর ইবাদত-উপাসনায় মগ্ন থাকেন। এখানেই আল্লাহ তায়ালার বাণী সত্য হয়ে ফুটে ওঠে।

"আবেদ-উপাসক আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন।" (ফাতির : ২৮)

তিনি যদি সনিষ্ঠ হন, গবেষণাগারে বা মাঠে অভিচিন্তনে, ধ্যানমগ্নতায় ও পর্যবেক্ষণে যে চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করেন, বিনিময়ে তিনি মহা প্রতিদান লাভ করবেন। অথচ তার অমুসলিম সহকর্মী তার মতোই পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে মুমিনের মতো প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না। এজন্যই মুমিন-মুসলিম বিজ্ঞানীকে তার সহকর্মী কাফির গবেষকের চেয়েও উন্নত হতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাকে প্রাধান্য লাভ করতে হবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের সেই আয়াতের কথা স্মরণ

করিয়ে দেয়, যা উহুদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল; যাতে ব্যথা-বেদনা ও জখম সত্ত্বেও মুমিন যোদ্ধাদেরকে মুশরিকদের ধাওয়া করার যে নির্দেশ দিয়েছিল।

"কাফের গোষ্ঠীকে ধাওয়াকরণে অলসতা করো না। তোমাদের মতো তারাও ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু তোমরা যা প্রত্যাশা করো, তা তারা করে না। আল্লাহ তায়ালাই বিজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (আল-নিসা : ১০৪)

যখন তার গবেষণার ধারাবাহিকতায় এমন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে সফল হন, যার দ্বারা মানব জাতি উপকৃত হয়; তাহলে তা তার জন্য অনিঃশেষ পূণ্য, সদকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে যতদিন তার গবেষণাকর্মের দ্বারা একজন ব্যক্তিও উপকৃত হবে, ততদিন তিনি এর প্রতিদান পেতে থাকবেন।

সুতরাং মুসলিম বিজ্ঞানীর সকল গবেষণা-ই চিন্তার ইবাদত বা উপাসনা। অবশ্য অন্য পক্ষে তা জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর যে নির্দেশ রয়েছে, তার বাস্তবায়ন। সেই নির্দেশ হল : জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ, বাধ্যতামূলক।[৭৪] তাই মুসলিম বিজ্ঞানীর কল্যাণমূলক সকল গবেষণা-ই অনিঃশেষ পূণ্য, সদকায়ে জারিয়া।

একটি সু-উচ্চ ইবাদত-উপাসনা হিসাবে আল্লাহ তায়ালার বিস্তৃত জগত নিয়ে ধারাবাহিক ভাবনা এবং বিজ্ঞানের উন্নয়নের মাঝে একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান, যা মুসলিম উম্মাহর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উন্নয়নের ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণিত। এতে তো কোনে সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিষয়ে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ছোঁয়া লাগিয়েছেন। যা দেখে সমগ্র বিশ্ব হতবাক। ইউরোপ তো তাদের কাছ থেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্জন করে। এর উপর ভিত্তি করেই তাদের আধুনিক সভ্যতার সৌধ নির্মিত। এতেও তো কোনো সন্দেহ নেই যে, এ উন্নয়ন ছিল আল্লাহ তায়ালার উপর গভীর বিশ্বাস, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বিষয়ে ভাবনার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণে, জ্ঞানার্জনে রাসূলের নির্দেশ পালনসহ আল্লাহর রীতি-পদ্ধতি, নিদর্শন ও সৃষ্টিজগতের কৌশল-গবেষণার প্রত্যক্ষ ফল ও পরিণতি।

জার্মান প্রাচ্যবিদ 'জিগরিয়া হুনকে' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "পশ্চিমা-আকাশে আরব সূর্য"–তে এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়ে বলেন: "মুহাম্মদ সা. সৃষ্টিজীব ও আশ্চার্যজনক বিষয়ের পাঠ-গবেষণায় তাঁর অনুসারীদের গভীরতাকে স্রষ্টার ক্ষমতা ও শক্তি-পরিচিতির মাধ্যমে হিসাবে বিবেচনা করতেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, জ্ঞানই ইমান-বিশ্বাসের পথকে আলোকিত করে।"[৭৫]

---

[74] 'সুনান ইবনে মাজাহ', সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুস্তাফা আল-আজমি, হাদিস নং- ২৩৭। (ইমাম বুসিরি 'জাওয়াইদ' গ্রন্থে লেখেন যে, এর বর্ণনা পরম্পরা দুর্বল।)

[75] জিগরিদ হানকে, 'শামস আল-আরাব তাসতাউ আলা আল-গারব', জার্মান থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ : ফারুক বাইদুন ও কামাল দাসুকি, দার আল-আফাক আল-জাদিদা প্রকাশনী, বৈরুত-১৯৮১,

"মুহাম্মদ সা. মুমিন নারী-পুরুষকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। একে তিনি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি সর্বদা মুমিনদেরকে জ্ঞানার্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন, নিজ অনুচর, সহচরদের এর জন্য নির্দেশনা দিতেন। তাদের বলতেন, শিক্ষার্জনের সোয়াব-পূণ্য রোজার পূণ্যের মতোই, শিক্ষাদানের সোয়াব-পূণ্য, নামাজের সোয়াবের মতোই।"[৭৬]

তেমনি প্রাচ্যবিদ 'হুনকে' বেশ জোর দিয়ে বলেন যে, "বেকন, গ্যালিলিও প্রমুখ পশ্চিমা বিজ্ঞানীগণই আধুনিক গবেষণা-রীতির উদ্‌গাতা নন, যেমনটা পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ ভেবে থাকেন। বরং বিজ্ঞান জগতের এই প্রান্তরে যারা অগ্রণী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন, তারা সবই মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদের অগ্রভাগে আছেন অনন্য প্রতিভা ইবনুল হাইসাম।" হুনিকাহ অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে এটা স্পষ্ট করেছেন যে, ইবনু হাইসামই আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক উদ্ভাবক! তার ভাষায় : "তিনি এ অবস্থানে উপনীত হতে পেরেছেন; গভীর চিন্তাভাবনার বদৌলতে, সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সেই সময়কার সভ্য-জগতে ইউক্লেড ও টলেমির কোনো বিকল্প ছিল না। তাদের তত্ত্ব ছিল 'মানব-চক্ষু যখন আলোক নিক্ষেপ করে। তখন চারপাশের বিষয়গুলো চক্ষু-গোচর হয়।' কিন্তু ইবনুল হাইসাম এসে এই সূত্রকে ভেঙে দেন। তিনি বলেন, 'চোখ থেকে আলোক সম্পাতের কোনো অবকাশ এখানে নেই, যার কারণে দৃষ্টি-শক্তি কার্যকর হয়। বরং দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর আকৃতিই চোখের উপর আলোকসম্পাত করে। তখন দৃষ্টি-সহায়ক কাঁচের মাধ্যমে চোখ তা দেখতে পায়।'[৭৭]

প্রাচ্যবিদ 'হুনকে' তার বর্ণনা আরো দীর্ঘায়িত করেন : "আলোকবিজ্ঞানের গবেষণায় ইবনুল হাইসাম সফলতা লাভ করেন। তার সফলতা এতোটাই উজ্জ্বল ছিল যে, বিজ্ঞানের এই শাখায় যা প্রচলিত ও পরিচিত ছিল, তিনি এর সব কিছুকে ছাড়িয়ে

পৃ: ৩৬৯। (জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থ-নামের অনুবাদে অমনোযোগিতার ছাপ বিদ্যমান। মূল জার্মান অনুসারে গ্রন্থ-নামের অনুবাদ হবে 'আল্লাহর সূর্যে আলোকিত প্রতীচ্য'।)

[76] জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের অসংখ্য নির্দেশনা বিদ্যমান। জিবরাইল আ. সর্ব প্রথম মুহাম্মদ স. এর কাছে যে আয়াত নিয়ে আসেন প্রমাণ হিসাবে তা-ই যথেষ্ট। তা হল "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন...।" তেমনি ইলম ও জ্ঞান শব্দের উল্লেখসহ এর অর্জনে ও এর গুরুত্ব-প্রকাশের লক্ষ্যে প্রায় ৪৮টি আয়াতে নির্দেশনা বিদ্যমান। তাছাড়া এর নিকটবর্তী অর্থসম্পন্ন শব্দের ব্যবহারও রয়েছে একাধিক জায়গায়। এসবই বোধ, বোধি ও বুদ্ধি নির্মাণে এবং জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। উপরন্তু হাদিসের এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যাতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা-বিষয়ক একটি অধ্যায়, ন্যূনতম পক্ষে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করা হয় নি। যেখানে রয়েছে ন্যূনতম পক্ষে প্রায় দশটির অধিক হাদিস। এর জন্য বুখারি ও মুসলিমসহ বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোর দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। তখন দুর্বল হাদিস বর্ণনার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। উৎসহীন হাদিস তো অবশ্যই নয়। যেমন জার্মান লেখিকা হানকে এখানে যে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, (১. তোমরা সুদূর চিন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন করো। ২. দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো।) রাসুল স. থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে এর কোনো ভিত্তিই নেই।

[77] জিগরিদ হানকে, পূর্বোক্ত।

যান। এভাবেই তিনি বিজ্ঞানের নতুন একটি ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ইবনুল হাইসামই প্রথম এক প্রকার ছিদ্রযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নিরীক্ষা-কার্য পরিচালনা করেন, যা বাস্তবে পরবর্তীতে আবিস্কৃত ক্যামেরার প্রাথমিক রূপ। সরল রেখায় আলোক বিস্তারকে প্রমাণ হিসাবে ধরেছেন। জল-বায়ু ও প্রত্যেক বিষয়ে আলোক-ভঙ্গের বিভিন্নতাকে নানা স্তরের ঘনত্বের কারণ হিসাবে নির্ণয় করেছেন। এরপর পূর্ব বর্ণনার উপর নির্ভর করে ভূমি-বেষ্টিত বায়ুস্তরের উচ্চতার পরিমাপ করেছেন। আর তা হল, পনের কিলোমিটার। এভাবে তিনি অসীম সূক্ষ্মতায়, অভূতপূর্ব নিখুঁততায়-নির্ভুলতায় একটি ফলাফল দাঁড় করান। আলোক-প্রতিফলনের নিয়মের পরিচিতি উদ্ধার করেন। তিনিই প্রথম পড়ার জন্য চশমা আবিষ্কার করেন। পশ্চিমা বিশ্বে এই আরবীয় প্রতিভার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। তার আবিস্কৃত তত্ত্বই পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখায় আজও পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।"[৭৮]

ন্যায়নিষ্ঠ এই প্রাচ্যবিদ বিভিন্নক্ষেত্রে তথা জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতবিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ন, প্রকৌশল ইত্যাদি সকল বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে অবদান রয়েছে, তা আলোচনা করেছেন। ইবনে সিনা ও তার গ্রন্থ "আল-কানুন" সম্পর্কে বেশ সাহসের সঙ্গে বলেন:

"এ এক অনন্য প্রতিভা, যা চিকিৎসা-বিদ্যার শাখা-প্রশাখাসহ বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক সকল জ্ঞানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি বিষয়কে তিনি অভিনবভাবে বিন্যস্ত করেছেন। একান্ত মৌলিকতা ও আলঙ্কারিক চাতুর্য্যে একে সজ্জিত করেছেন। এ গ্রন্থটি তাই সকল কালেই চিকিৎসা বিষয়ে একক গ্রন্থ হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। দীর্ঘ দিন থেকেই একেবারে সমানভাবে তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই চিকিৎসা-বিদ্যার ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই।"[৭৯]

এ হল কতিপয় উদাহরণ, যা মুসলিম বিশ্বে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-উন্নয়নের পরিস্থিতিকে স্পষ্ট করে তোলে। তখন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং সৃষ্টি জগতের নিয়ম-কানুন-বিষয়ক ভাবনা বিজ্ঞানভিত্তিক সেই নব জাগরণের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, যেই নবজাগরণ ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বাস-নির্ভর, সুপথপ্রাপ্ত, সৌভাগ্যের অধিকারী, এর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট প্রকৃত ভিত্তির উপর। কিন্তু মুসলিম জাতি এক সময় পিছিয়ে পড়ে, আবির্ভাব ঘটে ইউরোপের; যেন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার সৌধ নির্মাণ করতে পার। সেই সভ্যতা আল্লাহর নির্দেশ-বহির্ভূত ধারণা-কল্পনার উপর নির্ভর করে বসে। তাই সেই সভ্যতার ধারক-বাহক এবং পৃথিবীব্যাপী তাদের অনুসারীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে দুর্ভাগ্য ও প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা লাভ করে। আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, স্নায়ুবৈকল্য, মনোধিকার এবং অপরাধ-সংঘটনের

---

[78] পূর্বোক্ত।

[79] পূর্বোক্ত, পৃ : ২৮৯।

বিস্ময়কর পরিসংখ্যান তাই প্রমাণ করে। ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখাটা মানব-গোষ্ঠীর জন্য একটি দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ের জন্ম দেয়, যা আত্মা ও জড়-জগৎ এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে দুঃখজনক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে। পশ্চিমা ভাবুক বুদ্ধিজীবীদের লেখা থেকে এখন এটা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, মানব গোষ্ঠীর সভ্যতার দুটি সমপরিমাপের ডানা তথা ধর্মীয় নির্দেশনা ও মনুষ্য-কর্তৃক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে তার সুদিন ফিরে আসবে না, দুর্ভাগ্য থেকে নিস্কৃতি মিলবে না।

জাহেলি জড়বাদী-বস্তুবাদী ভাবনা পশ্চিমাদের শুধু এই কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে যে, বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের মানে হল 'প্রকৃতিকে বশীভূত করণ', যা আধুনিক জড় সভ্যতাকে খোদা-বিচ্ছিন্ন করেছে ও বিকৃত আকৃতি দান করেছে। এই জন্যই সমগ্র বিশ্বের এখন প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈমান-উদ্ভাবিত প্রশান্তির সম্পৃক্তির, সেই স্বস্তিবোধের– যা আল্লাহ তায়ালার পদ্ধতি ও জাগতিক নিয়ম-রীতি থেকে উৎপন্ন, প্রীতিপূর্ণ, সুসংগত ও প্রাকৃতিক। *"আল্লাহর নিয়ম পদ্ধতিকে তুমি কখনোই পরিবর্তন করতে পারবে না।"* (আল-আহজাব : ৬২, আল-ফাতহ : ২৩)

তা যদি সম্পন্ন হতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে বিরল কিছু বিজ্ঞানীর সন্ধান মিলবে। যাদের অন্তরে জগৎ-বিষয়ে কোনো শত্রুতার ভাব নেই, প্রকৃতিকে বশীভূতকরণে তারা উদগ্রীব নন। তারা হবে ইবনুল হাইসাম, জাবির বিন হাইয়ান, আল-খাওযারজেমি, আল-রাজি প্রমুখের মতো। যারা আল্লাহর সৃষ্টিজীব নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাদের মনে এর জন্য প্রীতিময় আবেগ বিদ্যমান ছিল। যারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহই স্রষ্টা ও জাগতিক নিয়মের নিয়ন্তা। তিনি এ জগতকে মানুষের অনুগত করেছেন, এর গোপন রহস্য-আবিষ্কার এবং নিয়ম-কানুন পরিচিতির সুযোগ ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তাই মানুষ আল্লাহর দ্বাসত্ত্ববরণসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং এ মহান ভূমিকা পালন করার জন্য তাদের বেছে নেওয়ায়, নির্বাচিত করায় শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

আমি অভিভূত হয়ে গ্রন্থটিকে *"তোমারই উপাসনা করি, তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।"* (আল-ফাতিহা : ৫) আয়াতের প্রাসঙ্গিকতায় শহিদ সাইয়েদ কুতুব র. যে দীপ্তিময় বাক্যের উপস্থাপন করেছেন– তার উল্লেখ করতে চাই, যেখানে জগতের সঙ্গে, সৃষ্টি-প্রকৃতির সঙ্গে মুমিন-বিশ্বাসীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম বর্ণনা বিদ্যমান, যা পশ্চিমা জড়-বিজ্ঞানীদের অস্বীকৃতি-প্রবণতার বিপরীত রূপ। সাইয়েদ কুতুব বলেন:

"রোমান জাহেলির উত্তরাধিকারী পশ্চিমাগণ প্রকৃতির শক্তিকে ব্যবহারের বিষয়টিকে বলেন, প্রকৃতিকে বশীভূত করণ। এই শব্দবন্ধেই খোদাবিচ্ছিন্ন জাহেলি মতদার্শের সুস্পষ্ট প্রকাশ। কিন্তু একজন মুসলিমের হৃদয় করুণাময়, দয়ালু প্রভুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তার আত্মা বিশ্ব-প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনাকারী অস্তিজগতের আত্মার সঙ্গে জড়িত। সে বিশ্বাস করে, রূঢ়তা ও বশীকরণের বাইরে এখানে ভিন্নরকম একটি

সম্পর্ক বিদ্যমান। তার বিশ্বাস, একমাত্র আল্লাহই এই শক্তি-সমষ্টির স্রষ্টা। তিনি একটি নিয়মের অনুসারে একে সৃষ্টি করেছেন, যেন সেই নিয়ম অনুযায়ীই নির্ধারিত উদ্দেশ্য-প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে পার। সূচনাতেই তা মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তার রহস্য উদঘাটন ও নিয়ম-পদ্ধতি জানার পথ সহজ করে দিয়েছেন। মানুষ যখন এর কোনো একটির সাহায্যে উপকৃত হবে, সফল হবে; তার দায়িত্ব সে সুবাধে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তা মানুষের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। মানুষ নিজ শক্তিতে তা বশীভূত করতে পারে নি। *"নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা বিদ্যমান, সবই তিনি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।"* (আল-জাসিয়া : ১৩)

তাই তার কল্পনাগুলো অনুভূতিকে প্রকৃতি-শক্তির সমুখে তৃপ্ত করতে পারে না। প্রকৃতি এবং তার মাঝে কোনো ভয়ঙ্করতা নেই। সে-ই এ নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে, এর প্রতি আকৃষ্ট হবে, উদ্ধার করবে এর সকল রহস্য। এরই সঙ্গে সুপরিচিত জগতের মাঝে প্রীতিপূর্ণ বন্ধুতার দিনযাপন করবে। উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রাসূল (সা.) যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর :

"উহুদ একটি পাহাড়। সে আমাদের ভালবাসে। আমরা তাকে ভালবাসি।"[৮০] এই শব্দসমষ্টিতে বিশ্ব-জগতের প্রথম মহান মুসলিম মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার পূর্ণতাকেই তুলে ধরে, তাঁর এবং প্রকৃতির মধ্যেকার পারস্পরিক বিনিময়কে বৃহত্তর ও গভীরতরভাবে ফুটিয়ে তোলে।[৮১]

৪০। 'সুনান ইবনে মাজাহ', হাদিস নং- ১৩৫২।

৪১। সাইয়দ কুতুব, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ : ২৫-২৬।

তথ্য সূত্র

المراجع الأساسية:

((تفسير القرآن الكريم)) لابن كثير.
((تفسير الكشاف)) للزمخشري.
((في ظلال القرآن)) لسيد قطب.
الأحاديث النبوية الشريفة في الصحاح والسنن.

أهم المراجع العربية:

رتبنا أهم المراجع العربية حسب الاسم الأخير للمؤلف بعد حذف التعريف بالألف واللام وكلمة ((ابن)):

(1) بدري، مالك بدري: ((علم النفس من منظور إسلامي))، مطبوعات اللقاء العالمي الرابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الخرطوم1987.

(2) بشير، التجاني يوسف بشير: ((ديوان إشراقة))، دار الثقافة بيروت، 1982.

(3) تيمية، الإمام أحمد بن تيمية: ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية))، مطابع الرياض.

(4) الجندي، أنور الجندي : ((الفصحى لغة القرآن))، دار الكتاب اللبناني، 1982.

(5) الجوزي، الإمام ابن الجوزي: ((صيد الخاطر))، مراجعة الأستاذ علي الطنطاوي، دار الفكر، دمشق، 1978.

(6) الجوزية، ابن قيم الجوزية: ((الفوائد))، المطبعة المصرية، 1344هـ.

(7) الجوزية، ابن قيم الجوزية: ((مدارع السالكين))، تهذيب عبد المنعم العلي الصالح العزي، دولة الإمارات، وزارة الأوقاف.

(8) الجوزية، ابن قيم الجوزية : ((مفتاح دار السعادة))، رئاسة الإفتاء، الرياض.

(9) حنبل، الإمام أحمد بن حنبل : ((الزهد))، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983.

(10) رضا، محمد رضا: ((محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم))، دار إحياء الكتب العربية، 1949.

(11) العقاد، عباس محمود العقاد: ((اللغة الشاعرة))، مكتبة غريب، القاهرة.

(12) عبده، الشيخ محمد عبده: شرح ((نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب))، دار الهدى الوطنية.

(13) الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي: ((الحكمة في مخلوقات الله))، دار إحياء العلوم، بيروت، 1984.

(14) الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي: ((إحياء علوم الدين))، دار القلم، بيروت.

(15) الغزالي، الشيخ محمد الغزالي: ((فقة السيرة))، دار الكتب الحديثة 1969.

(16) الفيومي، محمد إبراهيم الفيومي: ((الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل))، دار الفكر العربي، القاهرة.

(17) القاضي، بدكتور أحمد القاضي: ((تأشير القرآن الكريم على وظائف الجسم البشري وقياسه بواسطة أجهزة المراقبة الالكترونية)): عيادات أكبر، يانامانسيتي، فلوريدا.

(18) المحاسبي، الحارث المحاسبي: ((كتاب التوهم))، دار الوعي، حلب، سوريا.

(19) محمود، مصطفى محمود: ((لغز الحياة)): دار النهضة العربية: القاهرة.

(20) المودودي، أبو الأعلى المودودي: ((مبادئ الإسلام)) دار القرآن الكريم، دمشق، 1977.

مراجع مترجمة إلى اللغة العربية:

(21) مونسما، جون كلوفر مونسما: ((الله ينجلى في عصر العلم))، ترجمة الدمرداش عبد الحميد سرحان، طباعة مؤسسة فرانكلين، القاهرة، 1958.

(22) هونكه، زيغريد هونكه: ((شمس العرب تسطع على الغرب))، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1981.

"Hunke, Sigrid, Allahs Sonne Uber dem Abendland: Unser Arabishes Erbe".

مراجع أجنبية:

٢٣. Benson, H. Beyond the Relaxtion Response, Berkley, N.Y. 1985.
٢٤. Eccles, J.C. Facing Reality, Roche Co., N.Y. 1978.
٢٥. Encyclopaedia Britannica, William Benton Publishers, London, 1965.
٢٦. Le Shan, L. How to Meditate, Bantam Book, London, 1988.
٢٧. Uttai, W. The Psychobiology of the Mind, John Wiley, London, 1978.